মহাবিদ্রোহ
ও
তারপর

সুপ্রকাশ রায়

ভূমিকা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়



র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা

MAHABIDROH O TARPAR

[GREAT MUTINI AND AFTER]

by

Suprakash Roy

প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ :

জানুয়ারি ১৯৯৮

মুদ্রক :

গুপ্ত প্রেস

বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :

প্রদীপ চক্রবর্তী

প্রকাশক :

অরুণকুমার দে

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন

৪৬, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

দূরভাষ : ২২৪ ১৯৮৮



"ইহার পূর্বেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু এই বিদ্রোহ কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। এই বিদ্রোহেই সর্বপ্রথম সিপাহিগণ তাহাদের ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যা করিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ ভুলিয়া তাহাদের সাধারণ প্রভুর বিরুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল এবং হিন্দুদের দ্বারাই প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হইলেও শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সম্রাটকে বসাইয়া সেই বিদ্রোহকে পূর্ণতা দান করা হইয়াছিল।"

"বিদ্রোহ মাত্র কতিপয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এবং সর্বশেষে, ঈঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর এই বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মহান এশিয়াটিক জাতিগুলির সাধারণ বিরূপ মনোভাবের মিলন ঘটিয়াছিল, কারণ বঙ্গীয় বাহিনীর বিদ্রোহ নিঃসংশয়েই পারসিক ও চীনের যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।"

—কার্ল মার্কস

আমাদের প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই :

- গান্ধীবাদের স্বরূপ
- তেলেঙ্গানা বিপ্লব ('কাফি খাঁ' ছদ্মনামে লেখা)
- কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো : সংগ্রামের দিশা
- ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩—১৯৪৭)
- মাও সেতুঙ
- জাতি সমস্যায় মার্কসবাদ
- মার্কসের ক্যাপিটাল
- চীন বিপ্লব ও চীনের কৃষক
- সাঁওতাল বিদ্রোহ



সূচি

ভূমিকা

সব ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস—ইতিহাসটার ক্ষেত্রে এমন এক দিকনির্দেশ কেউ কেউ করেছেন। একথা আজ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে অতীতের ঘটনা নিয়ে যখন তথ্যপ্রমাণ সহযোগে ইতিহাস লেখা হয়, তখন তা অতীতের বিবরণ শুধু থাকে না, ইতিহাসবিদের বর্তমান ও তাঁর ভাবনা, বীক্ষা তাতে জড়িয়ে থাকে। ইতিহাসবিদ, এই ব্যক্তি ও তাঁর ইতিহাস নির্মাণের একটি অক্ষ। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ গত দেড়শো বছর ধরে এই নানা বিবরণকার ও ঐতিহাসিকের অক্ষে নানা ব্যাখ্যা ভাষ্য পেয়েছে, নানাভাবে নির্মিত হয়েছে। মহাবিদ্রোহের গুরুত্বই এখানে যে, এই ঘটনা এমনই বহুমাত্রিক ও বহুস্বরিক যে আজ পর্যন্ত নানা দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যাকে সে ধারণ করতে পেরেছে, আজও ঐ ঘটনার নতুন ভাষ্য রচনা হচ্ছে। নতুন উপমায় বিদ্রোহ নতুন অর্থ পেতে চাইছে। ২০০৬-এর বইয়ে এরকম তুলনা এসে যায় : 'The siege of Delhi was the Raj's Stalingrad' কিংবা সাম্প্রতিক খৃস্টান-ইসলামী সভ্যতার সংঘাতের এক প্রায়-তত্ত্বর ধাক্কাতেই বিদ্রোহকে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট থেকে বিচ্ছিন্ন করেই যেন খৃস্টান বিরোধী অভ্যুত্থান হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়। অর্থাৎ বিদ্রোহের প্রায় একশ, দেড়শো বছরের পরের ইতিহাসের উপমায় মহাবিদ্রোহকে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মহাবিদ্রোহ যেন সময়ের সঙ্গেই চলেছে।

১৯৫৭-য় মহাবিদ্রোহের শতবর্ষে ঘটনাটি সম্পর্কে নতুন করে চর্চা হয়েছিল। আর এই চর্চায় বাঙ্গালী ইতিহাসবিদরা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, বিদ্রোহের মূল্যায়নে সর্বদা ঐকমতে না পৌঁছালেও মোটামুটিভাবে এক জায়গায় ছিলেন। বিদ্রোহীরা জয়ী হলে যে, সমাজের ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরতো এমন একটা ধারণাই তাঁদের লেখা থেকে তৈরি হয়। এদের বিপ্রতীপ অবস্থানে ছিলেন শশীভূষণ চৌধুরী। ১৯৫৫-৫৭-য় তিনি বিদ্রোহকে অন্যভাবে দেখেন। ১৯৬৫-তে ভারতীয় মিউটিনির তত্ত্ব নিয়ে লেখেন। ১৯৭৮-এ আরও গুরুত্বপূর্ণ ১৮৫৭-৫৯-এর ভারতীয় মিউটিনির ওপর ইংরেজি ঐতিহাসিক লেখার ওপর তাঁর বইটি। শেষের বইটিতে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত মহাবিদ্রোহ নিয়ে যে নানা মত ব্যাখ্যা ভাষ্য তাঁর কথা বলেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন। মিউটিনিটির প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি : Opposite Views are re-stated with much the same emphasis. বৃটিশরা মহাবিদ্রোহের সামরিক চরিত্রের ওপর একান্ত গুরুত্ব আরোপ বিদ্রোহের একশ বছর পরেও করে গেছেন. ১৯৫৭-তেও বলেছেন বিদ্রোহ কোন স্বদেশপ্রেমের ঘটনাও নয়। ১৯৭৭-এ এই বক্তব্য স্থির, বিদ্রোহ স্বাধীনতার জন্য জাতীয়ভাবে সংগঠিত কোন আন্দোলন ছিল না, একটি সমগ্র দেশের প্রতি

আনুগত্যর ভাবনাই সিপাহীদের কাছে অর্থহীন ছিল। উল্টোদিকে বিশ শতকের গোড়াতেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহে বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে স্বাদেশিক প্রতিবাদকেই খুঁজে পায়। এ বিদ্রোহের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্তই দেখা দেয়। বিদেশী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ হিসাবেই বিদ্রোহ পরিগণিত হয়। এটি কেবল একটি সামরিক বিদ্রোহ, এ ব্যাখ্যায় তা মানা হয় না।

১৯৫৭-য় বিদ্রোহের শতবর্ষের সময় ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে এক নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় এর ওই প্রতিবাদের চরিত্রকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। কিন্তু তাঁদের বিস্তৃতভাবে দেখবার প্রচেষ্টা ও তথাকথিত নিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চা শেষ পর্যন্ত ঐ বৃটিশ লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীরই কাছাকাছি করে তুলেছিল। সুশোভনচন্দ্র সরকার রমেশচন্দ্র মজুমদারের বইটির আলোচনায় যথার্থই বলেন, "...অভ্যুত্থানের প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপারে সাধারণ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের সনাতনি ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তিই ঘটেছে। "আমাদের দেশের অধিকাংশ ইতিহাস-লেখক এখন পর্যন্ত তার অনুসরণ করছেন।" সুরেন্দ্রনাথ সেনের বইটি সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য : কিন্তু ১৮৫৭ সালের আলোড়নকে এমন সংকীর্ণভাবে দেখা কি যুক্তিসঙ্গত? এই তথ্যনিষ্ঠ প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার প্রয়াসে, তথ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, থেকে যায় ইংরাজ-লেখকদেরই প্রতিধ্বনি। এরপর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। মহাবিদ্রোহের সম্পর্কে বই প্রবন্ধ অনেক প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রোহের চেহারা ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা ক্রমশ জটিল হয়েছে, নানা অনালোচিত দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক বৃটিশ ব্যাখ্যা আর এখন কোনদিক দিয়েই গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। মহাবিদ্রোহকে কেবল সামরিক, রাজনৈতিক দিক থেকে আর দেখা হচ্ছে না। কৃষিগত পটভূমি, কৃষক-মালিকের অবস্থান, ভূস্বামীদের স্বার্থ—এ সমস্ত দিক থেকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে দেখা শুরু হয়েছে সেই ১৯৭০-এর দশকেই। সেই সঙ্গে "বিদ্রোহ" এক ধারণার বড় চন্দ্রাতপের জায়গায় এর স্থানীয় বা আঞ্চলিক চেহারার দিকেও লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি, গভীরতা বিশেষ অঞ্চলের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেছিল, কয়েক জায়গাতেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করার আগেই সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছিল। বিদ্রোহের এই আঞ্চলিক দিকের বিবেচনা বিদ্রোহ সম্পর্কে নতুন দিক খোলে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এখন আর একমাত্রিক বাস্তব নয়, পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষণীতে আমরা দেখছি এই বিরাট ঘটনার বাস্তবের নানাদিক, আর একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বুঝে নিতে চাইছি দেড়শো বছর আগের এই ঘটনার কোন তাৎপর্য, প্রাসঙ্গিকতা আজ কতটুকু। অধ্যাপক সরকার ঠিকই বলেছেন, "বাস্তবের অনুশীলন নিতান্ত সহজ নয়, বস্তুনিষ্ঠভাবে একটা বাঁধা বুলিতে পরিণত করা উচিত নয়, ঐতিহাসিকের কাজই এমন যে সেখানে দেশকাল নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্তের দাবি অচল।" তাই ১৮৫৭-৫৯-এর ঐ বহুমাত্রিক বাস্তবের নানা ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি; এ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার মূলে ইতিহাসবিদের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ তাঁর বর্তমান। ঐ বর্তমানের জন্যই বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক—এটা

কি শুধু সিপাহীদের সামরিক বিদ্রোহ, না জনগণের অভ্যুত্থান? বিদ্রোহকে কি জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া যায়? সামাজিক বিশ্লেষণে কি এটা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, পুরনো ব্যবস্থার শেষ আর্ত-চীৎকার? এই সূত্রেই এসে যায় গণ-অভ্যুত্থান বা আন্দোলন কাকে বলা যায়, জাতীয় ও জাতীয়তা কি? ১৮৫৭-য় পুরনো ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাকে বলা যায়? তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই পরস্পরবিরোধী মত আছে। সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী, হয়তো নিম্নবর্গবাদী ব্যাখ্যা বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আজও এই আবর্তন চলছে এবং ১৯৭০-এর দশক থেকে মহাবিদ্রোহকে তার অনুপুঙ্খ ধরে, বিশেষ স্থানকালের পটে (যেমন অযোধ্যা, মীরাট, দিল্লী) বোঝবার চেষ্টা হয়েছে।

সম্প্রতি, ২০০৭-এ ইরফান হাবিব একটি প্রবন্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছেন। ঔপনিবেশিকতার বৃত্তের পটভূমিতে রেখে তিনি বিদ্রোহকে অনুধাবন করতে চান। উপনিবেশিকবাদ ভারত থেকে ধারাবাহিকভাবে সম্পদের নিষ্ক্রমণ ঘটাচ্ছিল। এই নিষ্ক্রমণের ফলে ক্রমবর্দ্ধমান ও অতিরিক্ত করের বোঝা ভারতের জনগণের ওপর চেপে বসেছিল। বিশেষত মহলওয়ারি অঞ্চলে, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশে, ১৮১৯ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে এ অঞ্চলে কর বাড়ে শতকরা ৭০ ভাগ। অনেক জেলায় শতকরা ৫০ ভাগ জমির হস্তান্তর হয়। ফলে কৃষক ও জমিদার, উভয়ই এই সংকটে আক্রান্ত আর এ অঞ্চল বিদ্রোহের কেন্দ্র।

এর সঙ্গেই ছিল অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ। ইংরেজ শিল্পপণ্যের নির্মাতারা কার্যত শুল্কহীন ভাবেই ভারতে ঢোকে ১৮৩০-এর চার্টার আইনের পরে। ভারতীয়রা বিশেষত তাঁতী ও সুতো কাটনিরা বেকার হয়ে পড়ল। শহরের তাঁতীরা বিদ্রোহের সমর্থক, এমনকি বিদ্রোহের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবীও হয়েছিল। বাজার প্রসারিত করার তাগিদে নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা দখল করার দিকে বৃটিশ সরকার। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে ভারতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অঞ্চল এভাবে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিণতি পুরনো রাজত্বের বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবিকাচ্যুতি। এ অঞ্চলে, অযোধ্যাতে, পুরনো রাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে যোগ দেয়।

বেঙ্গল আর্মি ছিল এশিয়ার সর্ববৃহৎ আধুনিক সেনাবাহিনী। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বোঝা তারাই বহন করত, একের পর এক যুদ্ধে। এই চাপে সৈন্যবাহিনীর মনের ওপর যেমন আঘাত আসে, তেমনি তাদের আনুগত্যও চিড় খায়। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ যে উত্তেজনা ক্রমশ পুঞ্জিভূত করছিল, তাই যেন সংহত হলো সামরিক বাহিনীতে। যাতে একই ভাষার সৈন্য নিয়োগ করা যায়, তার জন্য বেঙ্গল আর্মিতে হিন্দুস্তানি ভাষা-অঞ্চল থেকেই সৈন্যনিয়োগ করা হতো। বৃটিশরা যেহেতু লেখাপড়া জানা সুশৃঙ্খল সৈন্য চাইছিল; সেহেতু, পদাতিক বাহিনীতে ব্রাহ্মণদেরই নিয়োগ করা হতো। এর ফলে বেঙ্গল আর্মিতে একটা জাত-বোধ সক্রিয় ছিল। ১৮৫৫-র পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কোন নিম্নবর্গের 'জাত'কে বেঙ্গল আর্মিতে

নিয়োগ করা হবে না। এই বেঙ্গল আর্মির সঙ্গে কিন্তু রাজা-নবাব-জমিদার-তালুকদারদের পুরনো রাজত্বের বিশেষ যোগ ছিল না। ঐ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের সহানুভূতিও ছিল খুব কম। চর্বি মেশানো কার্তুজই তাদের বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ। ব্রাহ্মণরা তাদের জাতের শুদ্ধতা সম্পর্কে ছিল খুবই স্পর্শকাতর। কিন্তু এটাভাবা ভুল যে তারা তাদের ধর্ম বাঁচাবার জন্যই বিদ্রোহ করেছিল। সিপাহীরা তাদের সামরিক প্রক্রিয়াতেই আধুনিক পদ্ধতি ওয়াকিবহাল ছিল, সংগঠন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও। সামন্ততান্ত্রিক কোন শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল না।

বেঙ্গল আর্মির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে একই ইউনিটে হিন্দু-মুসলমানদের রাখা হতো। চর্বি মেশানো কার্তুজের প্রশ্নটি সামনে এলে, অনেক সময়ই মুসলমান সিপাহীরা জানিয়েছিল যতদিন না হিন্দু ভাইয়েরা কার্তুজ মেনে নিচ্ছে, ততদিন তারাও মানবে না। বিদ্রোহ শুরু হবার পর সিপাহীরা নিজেদের তাদের সামরিক-নেতৃত্ব নির্বাচন করতে থাকে। দেখা যায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠরা হিন্দুকে নির্বাচন করছে এবং উল্টোটাও ঘটছে। এটা কোন সচেতন বিবেচনায় হিন্দু-মুসলমান সংহতির কথা ভেবে হয়েছিল তা নয়, স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ১৮৫৭-র বিদ্রোহে সিপাহীরাই মূল ভূমিকা পালন করে। তারাই ছিল বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। নিশ্চয়ই অন্যরাও ছিল। এই কেন্দ্রবিন্দুতে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সহমত ও সহযোগিতা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একলক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশি সিপাহীদের এই বিদ্রোহ বিশ্বে সবথেকে বড় ঔপনিবেশিক বিরোধী বিদ্রোহ। এত পেশাদার সৈন্য কোন বিদ্রোহে একসঙ্গে যোগ দেয়নি। এই দিকটি বিবেচনা করলে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ শুধু "মিউটিনি" না গণবিদ্রোহ—এই তর্ক অবান্তর হয়ে যায়।

হাবিব দেখিয়েছেন, প্রকৃতির দিক থেকে বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক নয়। বেঙ্গল আর্মির সিপাহীদের প্রজাতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক আবেগ ছিল স্পষ্ট। (এই বইয়ের পরিশিষ্টে সিপাহীদের সংবিধানটি দ্রষ্টব্য।) "Where they formed representative bodies, they chose to call them 'Councils', and elected their peers." দিল্লীতে নামমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহকে সামনে রেখেই বিভিন্ন সৈন্যগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লী শাসন করার জন্য 'কোর্ট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন' গঠন করে। হাবিব অনুমান করেন, বিদ্রোহ সফল হলে বৃটিশ কেন্দ্রীয় আইনসভার জায়গায় ঐ কোর্টই ভারতের পার্লামেন্ট হতো। লক্ষ্ণৌতেও সিপাহীরা এমন পরিষদ গঠনের জন্য চাপ দেয়। ঐ প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হতো। অর্থাৎ বেঙ্গল আর্মির সিপাহীদের আধুনিক সংগঠনের ধারণাই শুধু ছিল না, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছার প্রশ্নটির উপরও তারা গুরুত্ব দিয়েছিল। যে চারমাস দিল্লী সিপাহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেই চারমাসে তাদের কু-আচরণের সংখ্যাও ছিল সীমিত। তারা বেতন পাচ্ছিল না। তাই গোড়ার দিকে অ-সামরিক জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছিল। কিন্তু বেতন পাওয়া শুরু হতেই, আর সাধারণ মানুষকে বিব্রত করেনি। এমনকি কুসীদজীবীদেরও নয়। তারপাশে, বৃটিশরা দিল্লী পুনর্দখল করেই গণহত্যা ও লুণ্ঠনের বন্যা বইয়ে দেয়—তাদের আচরণই ছিল বর্বর ও মধ্যযুগীয়।

ধর্ম নিয়ে যে শ্লোগান, তাকে স্বাদেশিক মাত্রায় নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বলা হয় হিন্দু ও মুসলমান একেশ্বরবাদী আর খৃস্টানরা ত্রিত্ববাদী। মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মীয় মূল্যবোধ একরকম, ইংরেজদের সঙ্গে এ মূল্যবোধ ভাগ করে নেওয়া যায় না। আর হিন্দু ও মুসলমানরা ভারতের প্রতি আনুগত্য বহন করে, ইংরেজরা ভিন্নজাতির ভারতীয়দের অপমান করে, শোষণ করে। দিল্লী অধিকারের চারমাসে দিল্লীতে তিনটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়—দুটি উর্দুতে, একটি ফার্সিতে। বলা হয়, ইংরেজ শাসকেরা বিদেশি, ভারত থেকে সম্পদ শুষে নিচ্ছে। তারা খৃস্টান, অতএব একেশ্বরবাদি নয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে আল্লায় আর হিন্দুরা আদিপুরুষে অর্থাৎ একেশ্বরে। দিল্লী উর্দু 'আখবর' পাঠকদের 'স্বদেশী সাথী' বলে অভিহিত করতো আর বিদ্রোহী সৈন্যদের 'ফৌজ-ই হিন্দুস্তান' বা ভারতীয় সৈন্য। এই পত্রিকায় বীর ছিলেন প্রজাতন্ত্রী-মনের দিল্লীর মুখ্য সেনাপতি বখ্‌ত্ খান। আধুনিক কোন কোন লেখায় অন্যায়ভাবে তাঁকে ওয়াহাবী বলা হয়েছে। এই পত্রিকায় কায়িক শ্রমের মূল্যকে বড় করে দেখা হয়েছে। জনসাধারণের উচিত রাইফেল তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করা। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন নিন্দা পত্রিকাটিতে নেই। বরঞ্চ বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ডাক পরিষেবার পুনরুজ্জীবনই চাওয়া হয়েছিল। ১৮৫৭-র আগস্ট-এর এক ঘোষণায় একজন বিদ্রোহি নেতা ফিরোজ শাহ বলেছিলেন, বিদ্রোহীরা বাষ্পীয়পোত ও রেলপথের উন্নতি ঘটাবে।

বিদ্রোহে কৃষকদের অংশগ্রহণের পিছনে অতিরিক্ত করের বোঝা ছিল। বৃটিশরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে ও শোষণে এটা করে। সিপাহীরাও মূলত গ্রামের মানুষ। প্রধানত মহলওয়ারি অঞ্চলে ভূমিহারা হয়ে, দুঃসহ করের বোঝায় বিধ্বস্ত কৃষকরা বিদ্রোহকে সমর্থন করে। কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষত অযোধ্যায় জমিদার-তালুকদারের ডাকেও তারা সাড়া দেয়। মহাবিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক অভ্যুত্থান হিসাবে অনেকেই দেখতে চেয়েছেন। হাবিব বলেন, অনেক প্রধান নেতাই বিদ্রোহে ছিল যাঁরা হয় রাজা নয় জমিদার, বিদ্রোহে তাদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন কুনওয়ার সিং ও অমর সিং, জগদীশপুরের এই দুই জমিদার। ঐ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের এটুকুও সত্যি। বৃটিশরাই বলেছেন, এরকম বারোজন নেতা বিদ্রোহে থাকলে, ইংরেজ শাসনকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যেত না। ছিলেন ঝাঁসির রাণী, ছিলেন হজরৎ মহল। এঁরা ও আরও অনেকে সেই সময়কার বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ সাহসিক জাগরণে তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের রূপান্তর ঘটে, সেই সঙ্গে গণপ্রতিরোধের প্রাবল্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন আনে। ইরফান হাবিবের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় বেঙ্গল আর্মির চরিত্র ও এই নেতাদের চরিত্র এক ছিল না। ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া নিজের স্বার্থে যে সব "আধুনিক"কে এনেছিল, বেঙ্গল আর্মি আধুনিক সৈন্য হওয়ার সুবাদে এ সবের সঙ্গে পরিচিত— তারা আধুনিক ডাকব্যবস্থা, বাষ্পীয়পোত, রেলপথের বিরোধী নয়। এ সবের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন আবার নিজেদের সংগঠনে "আধুনিক" প্রজাতান্ত্রিক-

গণতান্ত্রিক ধারণাকেও তারা প্রয়োগ করেছে। সম্প্রদায়গত বিভেদকে সরিয়ে রেখেছে। বাইরের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই পুরনো ব্যবস্থার. বেঙ্গল আর্মির এই চেতনা তাদের ছিল না। কিন্তু তাঁরাও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধতায় জনগণের সঙ্গে সংযোগে বিদ্রোহের সময় তাঁদের জগৎ থেকে সরে এসেছিলেন। আর মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ছিল সিপাহীরাই।

হাবিব, তালুকদারদের নেতৃত্বে অযোধ্যার বিদ্রোহীরা যে সব ঘোষণা করেন, তার ভাষার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কথ্য হিন্দিতে ঘোষণাগুলি করা হয়েছিল। ১৮৫৭-র জুলাইয়ের একটি ঘোষণায় ছাপা হয়—তার বামদিক উর্দু লিপিতে ও ডানদিকে নাগরি লিপিতে লেখা। বয়ান দুদিকেই প্রায় এক। কিন্তু উর্দু কলমটিতে ফার্সি শব্দ ছিল খুব কম, নাগরিতে প্রাকৃতিকভাষাও তাই। লক্ষ্য স্পষ্ট, যাতে সাধারণ মানুষ ঘোষণাটি সহজেই বুঝতে পারে।

প্রথম দিকের আবেদনগুলিতে, ইংরেজরা পরাজিত হলে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যাসেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ক্রমে এই প্রতিশ্রুতি আর থাকে না। হজরৎ মহলের শিবির থেকে ১৮৫৭-র নভেম্বরের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার যে উত্তর দেওয়া হয়, তাতে এসব আর একদমই ছিল না। এ ঘোষণায় ভারতীয় জনসাধারণই পুরোভাগে। সৈন্য ও ভারতীয় জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তারা মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনায়পূর্ণ রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর ঘোষণাকে যেন বিশ্বাস না করে।

ইংরেজরা যদি প্রকৃতই ন্যায়নীতিতে বিশ্বাসী হতো, তাহলে তারা কেন মহীশূর টিপুকে ফেরত দেয় না, কিংবা পাঞ্জাব দিলীপ সিংকে—অযোধ্যার বিদ্রোহীরা এ প্রশ্নই তুলেছিল। ইংরেজরা প্রতিশোধস্পৃহায় নির্মম ক্ষমাহীন, সুতরাং জনগণ লড়াই ত্যাগ অবশ্যই করবে না। ইংরেজরা জিতলে ভারতীয়রা কুলিতে পরিণত হবে—রাস্তা কাটবে, খাল কাটবে।

ঝাঁসির রাণীর দৃষ্টান্তে বোঝা যায় পারিবারিক অভিযোগ অসন্তোষ বৃহত্তর কারণের মধ্যে কেমন রূপান্তরিত হলো। যতদিন না তাঁর শিশু উত্তরাধিকারীকে সরিয়ে ঝাঁসি ইংরেজ দখল করে নিয়েছিল, ততদিন ঝাঁসির রাণীর ইংরেজদের সঙ্গে কোন সমস্যা ছিল না। প্রাথমিকভাবে তিনি বিদ্রোহে যোগ দিতেও দ্বিধান্বিত ছিলেন। যখন দিলেন, তখন এমনভাবে দিলেন যে আগে তিনিও তা কল্পনা করেন নি। বিষ্ণু ভাট গডসেকে রাণী বলেছিলেন যে তিনি বৈধব্যের আচরণবিধি মেনেই বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এখনকার 'পাঠান' পোযাক। নিয়তিই তাঁকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে, যাতে তিনি হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম এখন আর প্রচলিত ধর্ম ও তার আচরণবিধি নয়, বিচ্ছিন্ন বিধবার জীবনযাপনও নয়, তাঁর কাছে হিন্দুধর্মর অর্থ, বিদেশীদের বিতাড়িত করতে হবে, এই প্রত্যয়। একজনের ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বাদেশিক অসাম্প্রদায়িক রূপে পরিবর্তিত হলো।

আমরা একটি পাক্ষিক-এ (ফ্রন্টলাইন, জুন ২০০৭) প্রকাশিত ইরফান হাবিবের

প্রবন্ধটিকে গুরুত্ব দিচ্ছি এই কারণে যে, গত দেড়শো বছর ধরে যে বিতর্ক মহাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, সেই বিতর্কগুলি নতুন প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধে আমরা পাই। সব থেকে বড় কথা, মহাবিদ্রোহকে তিনি দেখেছেন এক সচল বীক্ষায়। কিভাবে এই বিদ্রোহ পাল্টে দেয় জমিদার-তালুকদারদের ভূমিকা, ঝাঁসির রাণীর উত্তরণ ঘটে যায় বিদ্রোহের প্রক্রিয়ায়—একটা অনড় বাস্তব ও তথ্যভিত্তি নয়, একটা দ্বান্দ্বিক বীক্ষায় হাবিব মহাবিদ্রোহের প্রকৃতিকে দেখেন। দেখিয়ে দেন, বেঙ্গল আর্মি ও তালুকদার রাজাদের দৃষ্টিকোণের তফাৎ। বৃটিশ সামরিক বাহিনীর অক্ষে ঐ গ্রাম থেকে আসা হিন্দু-মুসলমানরাই সেই সময়ের "আধুনিক"কে বোঝে, ডাক-বাষ্পশক্তি-রেলপথকে প্রত্যাখ্যান করে না। এদের কেন্দ্রবিন্দুর পাশে থেকে তৎকালীন সিভিল সোসাইটির পরম্পরাগত নেতারা আর বিপুল কৃষক জনসাধারণ। এই ত্রিমাত্রীয় মহাবিদ্রোহ ছিল বহুস্বরিক।

বেঙ্গল আর্মি, অ-সামরিক নেতৃবৃন্দ এবং কৃষক ও জনসাধারণের আপ্রাণ লড়াই সত্ত্বেও বিদেশী শাসনমুক্ত ভারত হয়নি। এরপরও প্রায় নব্বই বছর এই শাসন ও শোষণ প্রত্যক্ষভাবে টিঁকে ছিল। এর নানা কারণের কথা ইতিহাসবিদরা বলেছেন, আবার সেইসব কারণ সম্পর্কেও নতুন গবেষণা হচ্ছে, যেমন ধারণা ছিল দক্ষিণভারতে এই বিদ্রোহের কোন প্রভাবই পড়েনি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়। বিদ্রোহের ব্যর্থতা ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও ভাবনায় কোন অভিঘাত কি এনেছিল? মহাবিদ্রোহের কোন উত্তরাধিকার কি লক্ষ্য করা যায়? বলা হচ্ছে, ভারতীয়দের স্মৃতিতে, জাতির নির্মাণ ক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন স্তর বিদ্রোহের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সমর্থনযোগ্য নানা উপাদান। স্মৃতির গহনের পলিমাটিতে এলিট ও লোক সর্বস্তরেও, বিদ্রোহ গণইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে বিদ্রোহ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তরাধিকারের অংশ—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং ঝাঁসির রাণী রেজিমেন্ট যেমন আমাদের ঐ উত্তরাধিকার। আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনেও বিদ্রোহের স্মৃতি মাঝে মধ্যে ঝলসে উঠেছে। সাভারকরের "১৮৫৭-র ভারতীয় স্বাধীনতাযুদ্ধ" বিশ শতকের গোড়ায় প্রকাশিত। নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া বইটি নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল, যদিও সাভারকর বিদ্রোহের হিন্দু-মুসলমান বহুস্বরিক ঐক্য থেকে দূরে চলে গিয়ে এক বিকৃত হিন্দুত্বের দিকে ক্রমে এগিয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহ আমাদের ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ অবধি জাতীয় আন্দোলনে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমোচনের জন্য লড়াইয়ের স্মৃতি হিসাবে প্রায় শেষ পর্যন্ত ছিল।

কিন্তু মূল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বাস্তব সক্রিয়তায় কি এ বিদ্রোহের কোন উত্তরাধিকার আমরা লক্ষ্য করি? বিদ্রোহটি ছিল সশস্ত্র, ঐ সশস্ত্র বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল মানুষ। নিশ্চয়ই যথার্থ ঐক্য, লোজিকটিক্স্-এর অভাবে নানা স্বার্থের টানাপোড়েনে, বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু বৃটিশ শাসনের ভিতসুদ্ধ যে নড়ে গিয়েছিল

বিদ্রোহে, তার কারণ ঐ সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ১৮৮৫ থেকে বলা ভাল ১৮৬০-এর দশক থেকেই আমাদের জাতীয়তাবাদের নানাবর্ণে এ উত্তরাধিকার আর নেই। ১৯২০-২১ থেকে তো অহিংসা প্রবল আকার নেয়—সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদী আন্দোলনে ব্যক্তিহত্যাই পথ ছিলো, ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিলেন, কিন্তু নিতান্তই অপরিকল্পিত ও অবাস্তব। সামরিক বাহিনী, জনসমাজের নেতা ও সাধারণ মানুষ—এই ত্রিমাত্রিক অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের কোন উত্তরাধিকারই পরবর্তী জাতীয় আন্দোলন বহন করেনি। সেই ১৯৪৬-এ নৌ-বিদ্রোহে এর একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু জনসমাজের দল ও নেতারা এই চেষ্টাকে বানচাল করে দেন—ভাগাভাগির বৈঠকে দেশভাগের দিকে যান।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের অন্যতম উজ্জ্বল দিক হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। বেঙ্গল আর্মি এই ঐক্যের প্রতিভূ। এই আর্মির বাইরেও ঐক্যর ধারা বর্তমান ছিল। ইংরেজদের লেখাতেও এই ঐক্যের কথা বলা আছে—হিন্দু-মুসলমান বিভেদের কোন সুযোগই তাদের নেওয়ার অবকাশ নেই। মহাবিদ্রোহের অসম্প্রদায়িক অভ্যুত্থানই বৃটিশদের ভারতনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে সামনে এনেছিল ভয় থেকে। ১৮৫৭-র পর তিনদশকের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়—ইংরেজি শিক্ষিতদের হাতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার কয়েক দশকের মধ্যে বৃটিশদের ভারতছাড়োর উদ্দেশ্যে একের-পর-এক গণ-আন্দোলন ও অভ্যুত্থান হয়। সবকটিই বৃটিশ সামরিক শক্তি দমিত করে। আর এর মধ্যেই মহাবিদ্রোহের এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যর ভারতচেতনা অবলুপ্ত হতে থাকে। দেখা দেয় হিন্দুজাতীয়তাবাদ; ক্রমে মুসলমান জাতীয়তাবোধ। পরপর তিনটি গণ আন্দোলনের পর স্পষ্ট হয় ১৯৪০-এর দশকে, হিন্দুরাষ্ট্র ও মুসলমানরাষ্ট্র সৃষ্টি অনিবার্য। নৌবিদ্রোহ এই অনিবার্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, ফিরিয়ে আনতে চায় মহবিদ্রোহের স্মৃতি শুধু নয়, আদর্শ ও পদ্ধতি। দেশের বাইরে সুভাষচন্দ্র বসু খানিকটা শিকড়হীন হয়ে এ চেষ্টা করেন। কিন্তু কংগ্রেস-লীগ রাজনীতির চাপ তা বাতিল করে, এমন কি কমিউনিস্টদের দ্বিধা তাকে ন্যুব্জ করে দেয়। একখণ্ডিত "স্বাধীনতা" আসে—বাঙ্গালীর জীবন, পাঞ্জাবীদের জীবন ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। আজও হিন্দু-মুসলমান মহাবিদ্রোহের ঐক্যের মনকে ফিরে পায়নি, তার রাজনীতিতে। ইংরেজি শিক্ষিত পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রে অভিষিক্ত, সেকিউলার রাজনীতির প্রবক্তারা, তথাকথিত অশিক্ষিত সিপাহীদের, পুরনো ব্যবস্থার এলিটদের "ভারতীয়" চেতনার পরম্পরাকে রক্ষা করতে পারেনি। ভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয় আন্দোলন তৈরি করেছে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান, পরে আবার খণ্ডীভবন—বাংলাদেশ।

সুপ্রকাশ রায়ের বইটির গুরুত্ব এখানেই। ১৯৬৬ ও '৭০-এর দু-তিনটি লেখা একত্র ক'রে এই বইটি নির্মিত। ১৯৭০-এর দশক থেকে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে একাধিক গবেষণায়, ভাষ্যে বিদ্রোহের যেসব দিকগুলি স্পষ্ট হয়েছে, সুপ্রকাশ রায় সেসব

দেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু ভারতের কৃষক ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসকার তাঁর মার্কসীয় বীক্ষায় সেই সময়ে বিদ্রোহের মূল্যায়নে যেসব বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তার থেকে মুক্ত ছিলেন। এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও তাঁর বইটি তাই প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে, মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে জানার পক্ষে এখনও এ আলোচনা পাঠ্য। সুপ্রকাশ রায় কোন পপুলার বা জনপদী বিবরণ লেখেন নি, ইতিহাসবিদের নিষ্ঠায় তথ্যের ওপর দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর সিদ্ধান্তের সূত্রের যথাযথ উল্লেখ করেছেন সর্বত্র। তথ্যসূত্র সবই ইংরেজি, কিন্তু বইটিতে সবই বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া আছে অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের জন্য, বাঙ্গালী পাঠকের জন্য। তিনি তথ্যভিত্তিক ইতিহাস লিখেছেন : আর ঐ তথ্য দ্বান্দ্বিক বীক্ষায় জড় থাকেনি, বর্তমানের কাছেও সরব হয়ে উঠেছে। বইটি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু বলছি না, কারণ এটাই প্রত্যাশা আজকের এই কবন্ধ অন্ধকারে সকলে বইটি পড়বেন এবং মহাবিদ্রোহের আজকের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করবেন।

সুপ্রকাশ রায় ১৮৫৭-র পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের কথা বলেছেন। বৃটিশ প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতির উদ্ভবের কথা বলেছেন। কিভাবে মহাবিদ্রোহের উত্তরাধিকার পরবর্তীকালের জাতীয় চেতনায় ক্ষীণ হয়ে গেল, লুপ্ত হয়ে গেল নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংযোগের মধ্যে—সেটাই এই অংশে বিধৃত। হয়তো মনে হতে পারে, এক্ষেত্রে রজনীপাম দত্তের অভিমত তাঁরও ছিল। কিন্তু আজ মনে হয়, ১৯৪০-এর দশকের ও পরবর্তীকালের কংগ্রেস দেখে যে রজনীপামই বোধ হয় ঠিক বলেছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে দাঁড়িয়ে, অবাক লাগে যে বেঙ্গল আর্মির পরম্পরাগত নেতৃবৃন্দ-কৃষক-জনসাধারণ কত অভ্রান্তভাবে সে সময়ে আমাদের বাস্তবের ও ইতিহাসের মূল কন্ট্রাডিকশনকে বুঝেছিলেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় মানুষের মধ্যে যে মূল কন্ট্রাডিকশন এটা ধরতে পেরেছিলেন, যেটা বুঝতে ইংরেজি শিক্ষিতদের অনেক সময় লেগেছিল। আর আজ তো আমরা আমেরিকার নেতৃত্ব, বিশ্বায়িত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের কন্ট্রাডিকশন বুঝতে পারি না, চাই না। তাই আমাদের মহাবিদ্রোহের স্বপ্নে ও ইতিহাসবোধকে আবার সামনে আনতে হয়, প্রাণের তাগিদেই।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলো কিছু ফটোগ্রাফ এবং বেশিরভাগই ইংরেজ শিল্পীদের আঁকা। স্বাভাবিকভাবেই আঁকাগুলোতে বৃটিশ বিক্রম ও বিজয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা আছে। আমাদের পাঠকরা সচেতনভাবে ছবিগুলো দেখবেন আশা রাখি। — প্রকাশক

মহাবিদ্রোহ
(১৮৫৭)

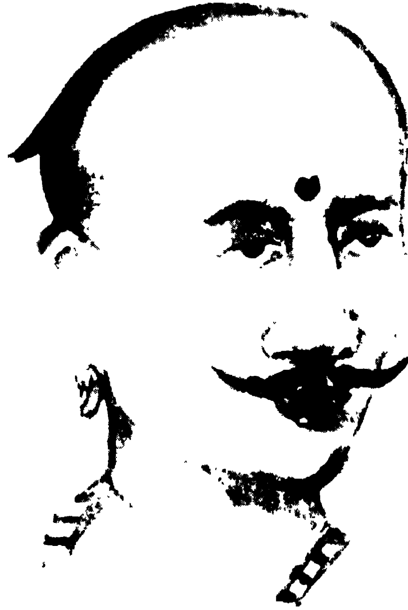
বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা —·—·—·—

বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু ●

Peshawar
Roorkee
Meerut
Delhi
Aligarh
Mathura
Hathras
Bharatpur
Nasirabad
Gwalior
Jhansi
Shahjahanpur
Fatehgarh
Etah
Agra
Mainpuri
Etawah
Kanpur
Sitapur
Lucknow
Faizabad
Banda
Fatehpur
Allahabad
Gorakhpur
Azamgarh
Arrah
Patna
Dehri
Hazaribagh
Ranchi
Barrackpur
Dacca
Chittagong
Indore
Jabalpur
Sambalpur
Cuttack
Kolhapur



বাংলা

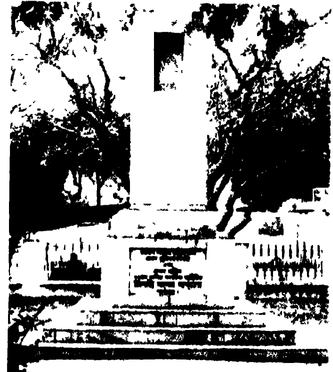


মহাবিদ্রোহের প্রথম বিদ্রোহী
মঙ্গল পাণ্ডে—বিদ্রোহের
অপরাধে ব্যারাকপুরে ফাঁসি
(মার্চ ২৯, ১৮৫৭)

অনুমান, ব্যারাকপুরের
লাটবাগানের এই বটগাছে
১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের
প্রথম শহিদ মঙ্গল পাণ্ডেকে
ফাঁসিতে ঝোলানো হয়



ব্যারাকপুরের ধোবিঘাটে
মঙ্গল পাণ্ডের স্মারকস্তম্ভ



বাংলা

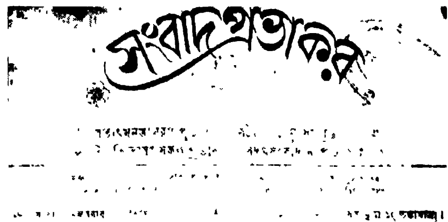


মহাবিদ্রোহের ইংরেজ নায়ক লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২)—গভর্ণর জেনারেল এবং প্রথম ভাইসরয়।



কলকাতার রাজভবন -মহাবিদ্রোহের সময় ক্যানিং-এর নিজস্ব বাসভবন

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পত্রিকা যা ইংরেজদের মদত দিয়েছিল



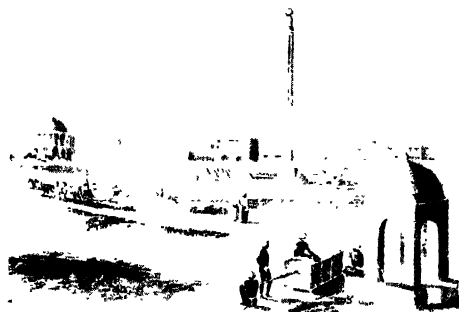
সংবাদ প্রভাকর



লাটবাগানে ঘোড়ায় চড়া ক্যানিং

লকাতা
১৮৫৭ সালে





৮৫৭ সালের
কলকাতার এসপ্ল্যানেড

৮৫৭ সালের
বাংলার ব্যারাকপুর





হরমপুর—স্কোয়ার ফিল্ডের চারপাশে এই রকম চারটে কামান আজও মনে করিয়ে দেয় ১৮৫৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির কথা—সিপাহীদের এই বিদ্রোহটাই মহাবিদ্রোহের শুরুর দিন হিসাবে চিহ্নিত



উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এইসব তুলো রেলপথে বন্দরে এবং সেখান থেকে জাহাজে ইংলণ্ডে নিয়ে যেত



১৮৫৭ সালে কলকাতার গঙ্গানদী এবং বন্দর এলাকা



ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সিপাই— এরাই মহাবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল



উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা বন্দরে আসত ইংলন্ডের পসরা



সিপাহীদের সাথে গ্রামের কৃষক এবং গ্রামের ধুনুরিরাও মহাবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল

বাংলা পেরিয়ে



বিহারের কানোয়ার সিং -- বিহারের আরা-র এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও জমিদার তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে রেওয়া, কানপুর, লক্ষ্ণৌ গিয়ে আবার আরাতে ফিরে আসেন। যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যু হয়।



বিহারের জগদীশপুরের বিদ্রোহী নেতা কুঁয়র সিং

ওড়িশার বিদ্রোহী নেতা সুরেন্দ্র সাঁই



হরিয়ানার বিদ্রোহী নেতা রাও তুলারাম





মিরাট

ইংরেজদের বাংলোতে সিপাহী আক্রমণ, মিরাট



প্যারেড গ্রাউন্ডে কর্ণেল খতম মিরাট (মে ১০, ১৮৫৭)



১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে সন্ধেবেলা বিদ্রোহী সিপাহীদের ইওরোপিয়ান ব্যারাক আক্রমণ



বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে কৃষকরাও

মিরাট



বিদ্রোহীদের শিকার কর্ণেল প্লট



দৃশ্য—কয়েকজন সিপাহী অপেক্ষারত
পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য



যুদ্ধে আহত দেশপ্রেমিকরা



সিপাহীদের ক্যাম্প

কানপুর



কানপুরের উপান্তে ব্রিটিশবাহিনী ও বিদ্রোহী অশ্বারোহী বাহিনীর সংগ্রাম



কানপুরে ব্রিটিশ-মহিলাদের বাসস্থান



নদীতে ব্রিটিশ-নিধন, কানপুর

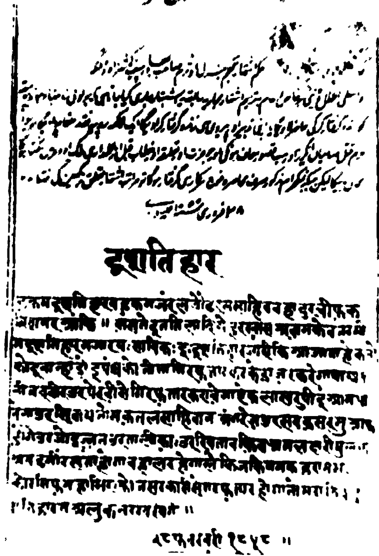


বিদ্রোহী সেনানায়করা

কানপুর



নানাসাহেব, কানপুর



মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা, নানা সাহেবকে জীবিত বা মৃত হাজির করলে লক্ষ টাকা ইনাম (হিন্দী ও উর্দুতে)

বন্দি অবস্থায় নানা সাহেবের সেনাধ্যক্ষ জওলাপ্রসাদ



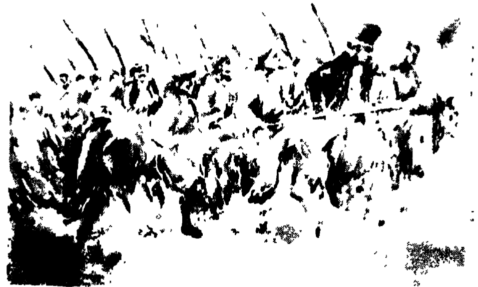
লক্ষ্ণৌ-এর মিলিটারি ক্যাম্প থেকে হাতির পিঠে কানপুরে ফিরছেন নানা সাহেব



লক্ষ্ণৌ



তাঁতিয়া টোপী



মহাবিদ্রোহ



বিদ্রোহী আক্রমণ,
লক্ষ্ণৌ (জুলাই ২০, ১৮৫৭)

বীরাঙ্গনা বেগম হজরত মহল



খনিগর্ভে লুকিয়ে ইংরেজ সৈন্য, লক্ষ্ণৌ



লক্ষ্ণৌ

বিদ্রোহীরা বিলিয়ার্ড খেলার সখ মিটিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্ণৌ





লক্ষ্ণৌর দৃশ্য

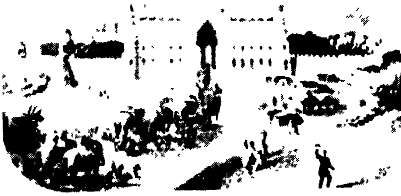
বেগম-কুঠি, লক্ষ্ণৌ





দিলখুস প্রাসাদ, লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্ণৌ



ক্ষ্ণৌ (১৮৫৭)—ইংরেজ সৈন্য ঢুকছে



ত্তরপ্রদেশ—১৮৫৭ সালের ৮ জুন
বাদলি কি সরাই-এ সিপাহীদের
লড়াইয়ের দৃশ্য

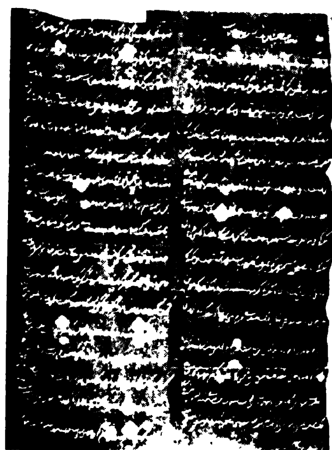


দ্ধে আহত ব্রিটিশ-অফিসাররা

হাবিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক
তাঁতিয়া টোপী—বন্দি অবস্থায়
(ফাঁসি : এপ্রিল ১৮, ১৮৫৯)



ঝাঁসি



ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর হস্তলিখিত চিঠি



* মহাবিদ্রোহের মহানেত্রী ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ—গোয়ালিয়রের কাছে যুদ্ধে মৃত্যু—জুন ১৭, ১৮৫৮। তিনি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। কথিত আছে, তাঁর জীবন-সঙ্গী একজন মুসলিম মহিলা যোদ্ধা তাঁর মৃত্যুর আগেই যুদ্ধে মারা যায়।

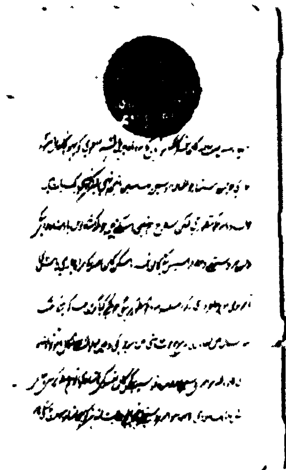


ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ
(গজদন্তের উপর আঁকা)

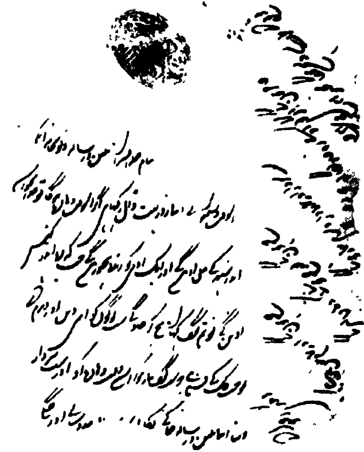


ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

দিল্লি



মহাবিদ্রোহের সংবিধান (উর্দুতে)



দিল্লির বিদ্রোহী সেনানায়ক ভকত্ খানের ঘোষণাপত্র। তিনি আশঙ্কিত ছিলেন ইংরেজ দিল্লিতে ঢুকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় প্ররোচিত করবে। [National Archives of India collection no 57, serial no. 461, dated September 10, 1857]



বৃদ্ধ, অশক্ত মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর

দিল্লি

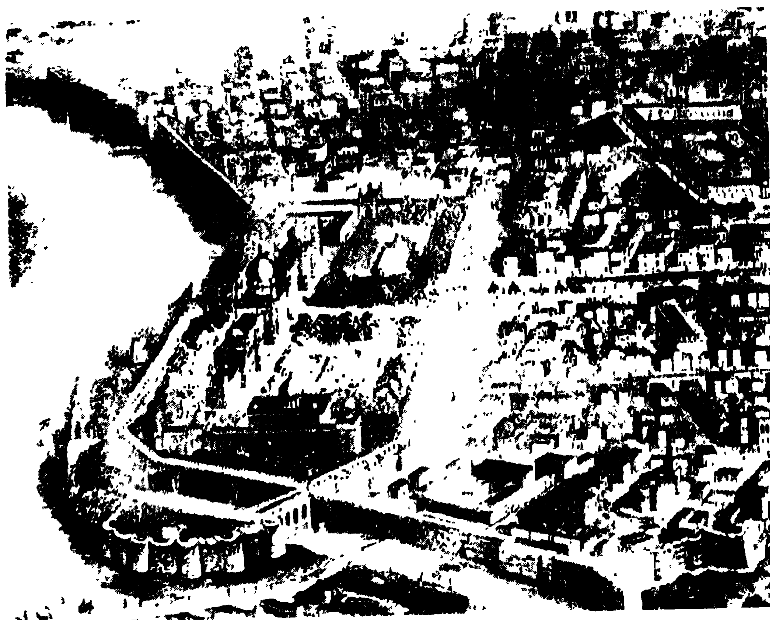


২ বছর বয়সের বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর (আবু জাফর সিরাজুদ্দিন মহম্মদ বাহাদুর শাহ্)

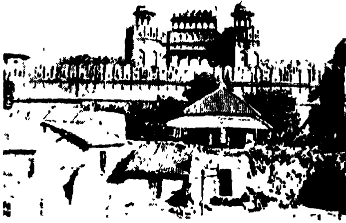


গম জিনাত মহল (১৮২১-৮২)

৮৫৭ সালের ১১ মে যমুনার এপার থেকে দেখা যাচ্ছে লালকেল্লা আর দিল্লি শহর



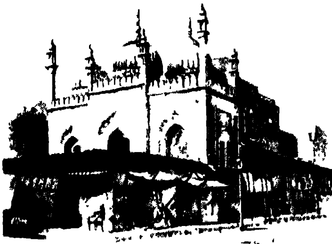
দিল্লি



দিল্লির লালকেল্লা



দিল্লিতে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি লালকেল্লা



১৮৫৭ সালের চাঁদনি চক



মহাবিদ্রোহের সময় দিল্লির অন্যতম ব্যস্ত এলাকা চাঁদনি চক, ১৮৫৭



ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা (১৮৫৭)—এখানেই বাহাদুর শাহ্-র দুই পুত্র এবং নাতিকে খুন করা হয়

দিল্লি

প্যালেস গেট থেকে দিল্লি শহর—মিরাট ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে সিপাহীরা দিল্লি চলে আসে পরের দিন, ১১ মে





সিপাহীরা আলোচনারত

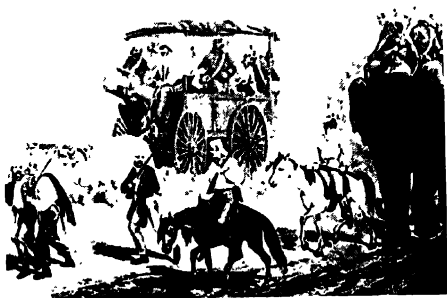
দিল্লির এই গাছে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের লটকানো হয়





দিল্লি—১৮৫৭-র বিদ্রোহ শুরুর দিন এই ব্যাংক আক্রান্ত হয়

দিল্লি







দিল্লির পথে ইংরেজ হানাদার



দিল্লির কাছে ইংরেজদের অস্ত্র বোঝাই গাড়িতে সিপাহী আক্রমণ

যুদ্ধ

সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ



যুদ্ধ : সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ



বিদ্রোহীদের পশ্চাদপসরণ



ইংরেজদের কাশ্মীর-গেট দখল



হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ—এখানেই বাহাদুর শাহ্ লুকিয়েছিল



হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ থেকে বেরিয়ে বাহাদুর শাহ্ ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন হডসনের হাতে বন্দি হলেন (২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭)

যুদ্ধ : সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ



মুঘল সম্রাটের শেষ-বিখ্যাত-চিত্র—
বিচারের পরে স্ত্রী-পুত্র সহ
নির্বাসনে
রেঙ্গুন যাবার আগে

রেঙ্গুনে বন্দী বাহাদুর শাহ্ জাফরের দৃপ্ত কবিতা—

غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی
تب تو لندن تک چلے گی تیغ ہندستان کی
بہادر شاہ ظفر

গাজিও মেঁ বু রহেগি যব তলক ইমান কি।
তব তো লণ্ডন তক চলেগি তেগ হিন্দুস্তান কি।।

(আত্মসম্মানের সৌরভ যতদিন যোদ্ধাদের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকবে,
ততদিন আশা ভারতের দাপট একদিন না একদিন পৌঁছবে লণ্ডনে।)



ব্রিটিশ নৃশংসতায় কাতর
কবি মির্জা গালিব লিখলেন—
আমার সামনে আজ খুনের দরিয়া

ধ্বংস-হত্যা-লুট-নৃশংসতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



কাশ্মীর গেটের ধ্বংসাবশেষ

সিপাহীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে ইংরেজ উড়িয়ে দিয়েছিল দিল্লির এই সেনা ছাউনি





ব্রিটিশ-হিংসার স্বাক্ষর, লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্ণৌর সিকন্দর বাগের ভেতরের সমসাময়িক চিত্র। মৃতদেহের সমারোহ —ব্রিটিশ নৃশংসতা



ধ্বংস-হত্যা-লুট-নৃশংসতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



ব্যারাকপুরে বিদ্রোহী সিপাহীদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল



কানপুরে সিপাহী-বিদ্রোহীদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে



গ্রামের মানুষের উপর ব্রিটিশ-বর্বরতা

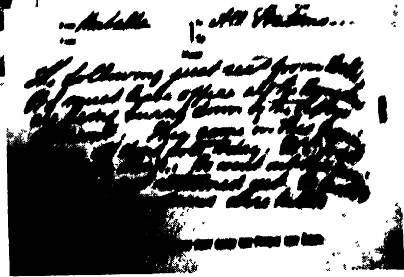


বেরিলির যুদ্ধে (মে ৫, ১৮৫৮) ১৩৩ জন বিদ্রোহীকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা

ধ্বংস-হত্যা-লুট-নৃশংসতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



মৃতের সম্পত্তি লুণ্ঠন, লক্ষ্ণৌ



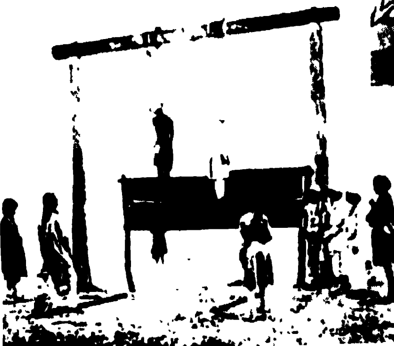
ভারত-বিজয়ের টেলিগ্রাম



দিল্লিতে বিদ্রোহীদের গণ-ফাঁসি



ব্রিটিশ নৃশংসতা



দিল্লির রাজপথে ফাঁসিতে মহাবিদ্রোহের দেশপ্রেমিকরা

ধ্বংস-হত্যা-লুট-নৃশংসতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



নিরস্ত্র মানুষের দিকে কামান দাগা হচ্ছে



কামানের গোলায ব্রিটিশ 'Mercy Killing' লক্ষ্ণৌ

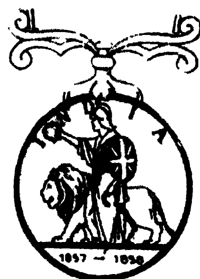


ক্যাম্পে ব্রিটিশ শয়তানেরা আয়েসরত



ব্রিটিশদের আঁকা বিদ্রোহীদের নৃশংসতা

ধ্বংস-হত্যা-লুট-নৃশংসতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



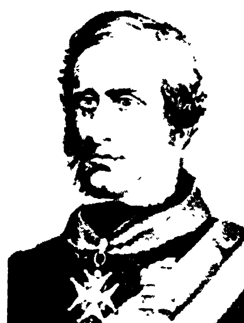
মহাবিদ্রোহ দমনের বিট্রেশ পদক



ব্রিটিশ-সর্দার
লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২)



স্যার জেমস আউটরাম



স্যার হেনরি হ্যাভলক



মেজর জেনারেল
জেমস নেইল

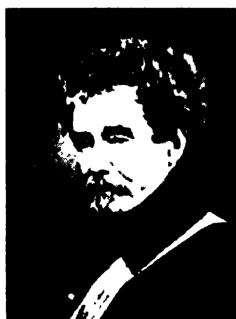


স্যার হেনরি লরেন্স



স্যার আর্সডল উইলসন

ধ্বংস-হত্যা-লুট-নৃশংসতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ



স্যার কলিন ক্যাম্পবেল



সস্ত্রীক লেফটেন্যান্ট জর্জ উইলাউবাই



উইলিয়াম হডসন—এর কাছে বাহাদুর শাহ বন্দি হন। রাজপুত্রদের হত্যাকারী হিসাবে কুখ্যাত



ভারতীয় পোশাকে এল. ই. আর. রিস



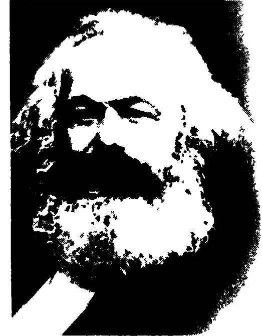


ভারতীয় শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের তুলিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মহাবিদ্রোহ

আন্তর্জাতিক মহাবিদ্রোহ



ব্রিটিশ ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে 'পাঞ্চ' পত্রিকায় ভিক্টোরিয়ার কার্টুন



'বিদ্রোহ মাত্র কতিপয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই এবং সর্বশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর এই বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মহান এশিয়াটিক জাতিগুলির সাধারণ বিরূপ মনোভাবের মিলন ঘটিয়াছিল। কারণ বঙ্গীয় বাহিনীর বিদ্রোহ নিঃসংশয়েই পারসিক ও চীনের যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।'

—কার্ল মার্কস্

চার্টিস্ট নেতা, আর্নেস্ট জোন্সের কবিতায় মহাবিদ্রোহের অভিনন্দন (The Revolt of Hindostan ১৮৫৭ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়)

THE REVOLT OF

HINDOSTAN;

THE NEW WORLD

A POEM,

ERNEST JONES

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

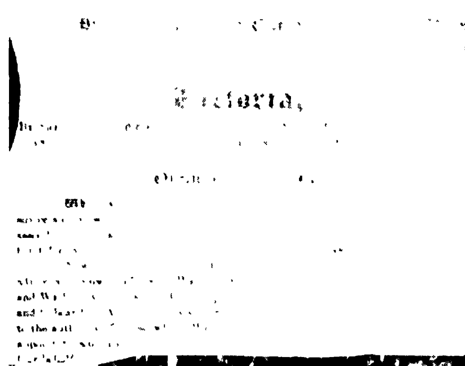
রুশ মনীষী ডব্রোলিউবভ কর্তৃক বিদ্রোহ দমনের নিন্দা

জার্মানীতে Ilustrierte Zeitung -পত্রিকায় মহাবিদ্রোহ দমনে ইংরেজের পাশব নীতির বিরুদ্ধে রচনা ও ছবি ১৮৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ



মহারাণী ভিক্টোরিয়া



Victoria,

রাণীর ঘোষণাপত্র



মহাবিদ্রোহের পর রাজ-অনুগতদের ক্যানিংয়ের উপহার

লর্ড লিটন



লর্ড রিপন



মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ

INDIA
GROWTH OF RAILWAY SYSTEMS

রেলপথের সম্প্রসারণ

ভারতে শিল্পপত্তন ও শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব

কয়লা

বেঙ্গল কোল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা : ১৮৪৩
ঝরিয়ায় বড় বড় কয়লাখনির কাজের সূচনা : ১৮৯৭
কয়লাখনির শ্রমিকের সংখ্যা :
১৮৯৪ সালে : ৬০,৭৭০
১৯০৬ সালে : ৭৪,০৫৮

চা-বাগান

আসাম টি কোম্পানি (ব্রিটিশ) : ১৮৩৯
চা-বাগান শ্রমিকের সংখ্যা :
১৮৯০ সালে : ৪০৩,০৮৯
১৯০০ সালে : ৬৬৪,৮১৭

চটকল

প্রথম চটকল : রিষড়ায় অকল্যান্ড মিল : ১৮৫৪
ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা : ১৮৮৪
চটকল শ্রমিকের সংখ্যা :
১৮৭৯-৮০ : ২৭,৪৯৪
১৯০২-০৩ : ১,১৮,২০৪

কাপড়কল

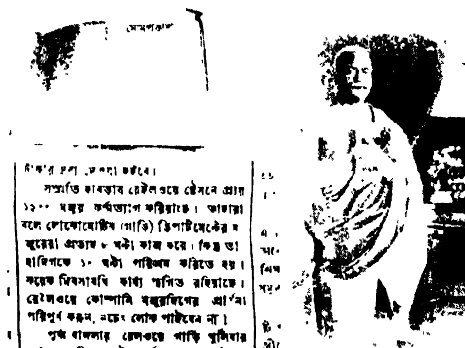
বাংলার প্রথম কাপড়কল : বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লস্টার মিল : ১৮১৮ বোম্বাইয়ের প্রথম কাপড়কল (কাওয়াসজী নানাভয় দাভার প্রতিষ্ঠিত) : ১৮৫৪; ১৮৭৯-৮০ সালের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৫৮টি কাপড়কল প্রতিষ্ঠিত।
১৮৮৬ : মোট ৯৫টি মিলে শ্রমিক সংখ্যা : ৭৪,০০০
১৯০৫ : মোট ১৯৭টি মিলে শ্রমিক সংখ্যা : ১,৯৫,০০০

ভারতে শিল্পপত্তন ও শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব

'কেশরী'

केसरी.

রেল শ্রমিক ধর্মঘট (১৮৬২) প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'-এ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ



সম্প্রতি হাবড়ার রেইলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিব (গাড়ি) ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক পাইবেন না।
পূর্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে গাড়ি পুড়িবার

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন





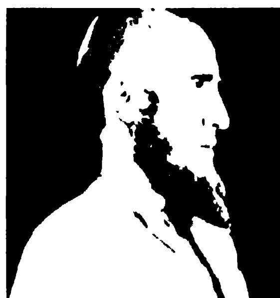
ফার্দুলজি নৌরজী



আন্দামানের ভাইপার দ্বীপে শের আলির ফাঁসির জায়গা

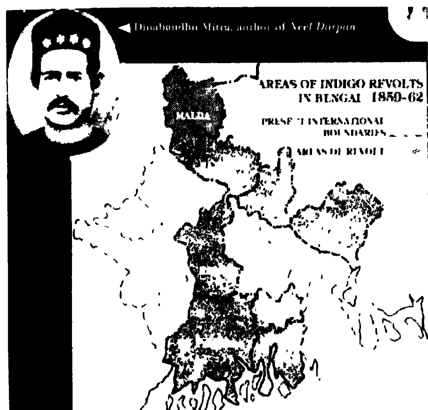


ভারতের বড়লাট, লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনকালে ১৮৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শের আলির ছুরিকাঘাতে নিহত



আন্দামানে ওয়াহাবি শহিদ, শের আলি

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ



বাংলার নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬২)
'নীল-দর্পণ' নাটকের লেখক
দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৪-৭৩)



'নীল-দর্পণ'-এর ইংরাজি অনুবাদক
রেভারেন্ট লঙ্ (১৮২৪-৮৭)

১৮৭৯ সালে মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র
কৃষক-বিদ্রোহীদের নেতা
বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে।
কারাগারে মৃত্যু ১৮৮৩



যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)
—ভগৎ সিং-এর বাবাকে বিপ্লবের পথে
আকৃষ্ট করেন।



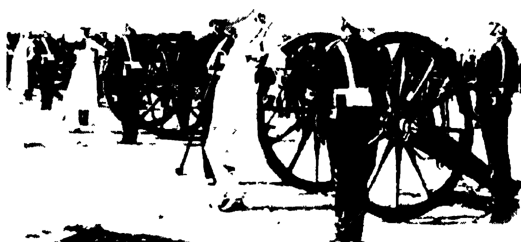
মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ





অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের জন্য রাশিয়ার তাসখন্দে রাম সিং-এর দূত গুরুচরণ সিং

পাঞ্জাবের কুকা বিদ্রোহের নেতা গুরু রাম সিং (১৮১৬-৮৫) —রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন



‘‘৯ জন কুকা বিদ্রোহীকে কামানের মুখে বেঁধে কামান দেগে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। রুশ শিল্পী-পর্যটক ভেরেশ্চাগিনের আঁকা ব্রিটিশ 'Mercy Killing'-এর ছবি



শহিদ লেহ্না সিং



শহিদ হীরা সিং কামানের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়--'Mercy Killing'-এ

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ



বিডন স্কোয়ারে (কলকাতায়) ১৮৮৩ সালের ১৬ মে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ভারতীয়দের সভা



ইংরেজরা বিদ্রোহী পাঠান গ্রামবাসীদের সঙ্গে (১৮৯০ সাল পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম এই অংশে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত ছিল।)



টিকেন্দ্রজীৎ ১৮৯১ সালে মণিপুরে ব্রিটিশ বিরোধীতার জন্য মৃত্যুদণ্ড

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ



বিহারের ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুণ্ডা (১৮৭৪-১৯০০) ৩ জানুয়ারি, ১৯০০ রাঁচি জেলে মৃত্যু



বীরসাপন্থীদের গ্রেপ্তার, জানুয়ারি, ১৯০০

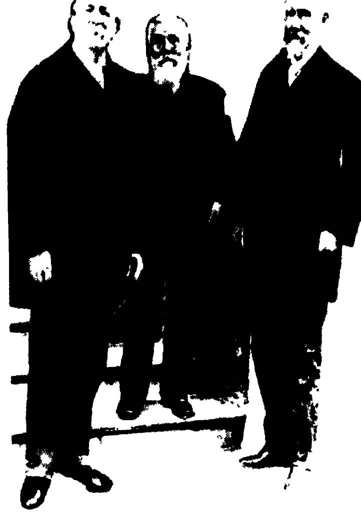


বন্দি বীরসা মুণ্ডা

কংগ্রেসের জন্ম



কংগ্রেসের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ সাহেব এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম



কংগ্রেসের তিন প্রতিষ্ঠাতা—হিউম, দাদাভাই নৌরজী, ওয়েডারবার্ণ (বাঁদিক থেকে)

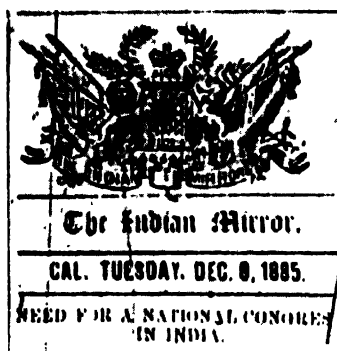


কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ—গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ, বম্বে, ২৮-৩০ জানুয়ারি, ১৮৮৫

কংগ্রেসের জন্ম

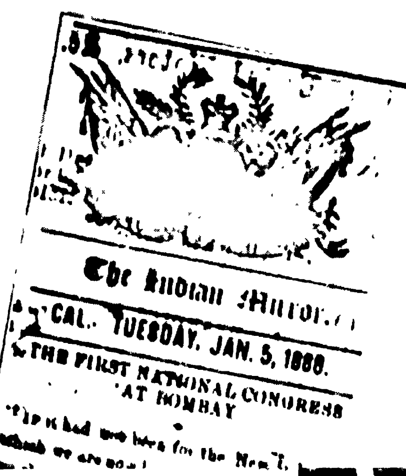


The Indian Mirror.

CAL. TUESDAY. DEC. 8, 1885.

NEED FOR A NATIONAL CONGRESS IN INDIA.

It is constantly being thrown ... teeth by some of our Anglo-Indian ... that there is no ... nation, and ...



The Indian Mirror.

CAL. TUESDAY. JAN. 5, 1886.

THE FIRST NATIONAL CONGRESS AT BOMBAY

"If it had not been for the ..."

POLITICAL AND SOCIAL REFORM AND THE PRESENT NATIONAL REAWAKENING IN INDIA.

A most noticeable feature of the times is the abnormal movement of political life, that is now visible among the educated people throughout India. It seems that the National Congress at Bombay has been followed by an unusual tide of political activity among the people of ...

'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের বিভিন্ন বিবরণ



লর্ড ডাফ্‌রিন, ভাইসরয়,
১৮৮৪-১৮৮৮



লর্ড কার্জন, ভাইসরয়,
১৮৯৯-১৯০৫



১৮৯৭ সালে লণ্ডনে
দিনশ ওয়াচা,
নৌরজী,
গোখলে
(বাঁদিক থেকে)



ফিরোজশা মেহতা



দাদাভাই নৌরজী



গোপালকৃষ্ণ গোখলে

কংগ্রেসের জন্ম



১৯০৬ সালের চিত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ
বসে (বাঁদিক থেকে)—বি. চক্রবর্তী, এ. চৌধুরী, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, দাদাভাই নৌরজী, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে)—রতন টাটা, জি. কে. গোখলে, ডি. ই. ওয়াচা, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এস. পি. সিন্‌হা



ভি. সুব্রমনিয়া আয়ার



এস. সুব্রমনিয়া আয়ার



কাশীনাথ ত্রিমবাক তেলঙ্গ



এম. ভীরাবাঘবাচারিয়া

মহাবিদ্রোহ

১৮৫৭-৫৮



মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮)

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরের কথা। এই একশত বৎসরের ইংরেজ রাজের রক্তকলুষিত শাসন আমাদের সোনার ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। সারা ভারতের চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ রাজের ভারতগ্রাস ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল বাংলা ও বিহার হইতে, পাঞ্জাব দিয়া সেই গ্রাস শেষ হইল। তখন দেশের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

তখন দেশীয় রাজারা নামমাত্র স্বাধীনতা লইয়া নিজ নিজ রাজ্যের গদি আঁকড়াইয়া ছিল। ইংরেজরা এবার দেশীয় রাজ্যগুলিকেও গ্রাস করিতে প্রস্তুত হইল। ইংরেজ রাজের এই রাক্ষুসে ক্ষুধা মিটাইবার ভার লইয়া লর্ড ডালহৌসি বড়লাট হইয়া আসিয়াছে। বড়লাট সাহেব ছলে-বলে-কৌশলে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিতে থাকে। ইংরেজ রাজের গ্রাসে গিয়াছিল পেশোয়া রাজ্য সাতারা, ভোঁসলারাজ্য নাগপুর, রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর ঝাঁসী, নিজামের বেরার, মারাঠাদের সম্বলপুর, তাঞ্জোর, মুসলমান রাজ্য কর্ণাটক, আর সকলের শেষে শিখদের পাঞ্জাব। ইংরেজরাজ শতখণ্ডে ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছে।

দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিবার পিছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, এক রাজনৈতিক ও অপরটি অর্থনৈতিক। **প্রথমত**, শতখণ্ডে বিভক্ত ভারতকে একটিমাত্র শাসনের অধীনে আনিতে পারিলে এই বিশাল দেশের জনসাধারণের বিরোধিতা চূর্ণ করা সহজ হইবে। **দ্বিতীয়ত**, ভারতের ধনদৌলত ও কৃষিজাত দ্রব্য (শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল) ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে সকল দেশীয় রাজ্য গ্রাস করিল, সেইগুলির গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজাত দ্রব্য ছিল শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দুই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সমগ্র ভারতকে গ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা এদেশে রেলপথ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিদ্রোহী ভারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে শোষণ করিবার জন্য এবার এই দেশে রেলপথ হইল ইংরেজ-রাজের প্রধান হাতিয়ার। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম রেলপথ তৈরী হইয়াছিল বিদ্রোহী ভারতের তখনকার প্রধান কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, আর রেলপথ তৈরী হইয়াছিল বাংলাদেশে। বেরার ও নাগপুর দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের তুলা ইংলণ্ডে চালান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের কাপড়ের কারখানার কেন্দ্র ম্যানচেস্টার তখন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, ম্যানচেস্টারের তুলার চাহিদা মিটাইবার জন্যই ইংরেজ শোষকদের প্রয়োজন হইয়াছিল বেরার ও নাগপুর। ম্যানচেস্টারের কাপড়ের কলে বেরার ও নাগপুরের তুলা দিয়া তৈরী সস্তা কাপড় আসিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্পকে

উচ্ছন্নে পাঠাইয়া ইংলণ্ড হইয়া উঠিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ।

একথা সত্য যে, ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পর হইতেই দেশীয় রাজ্যের রাজা ও মহারাজের দল ইংরেজের রাজশক্তির নিকট মাথা নত করিয়া তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। যখন ভারতের বিদ্রোহী সাধারণ মানুষ এই বিদেশীদের প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল, এই শত্রুর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ দিয়াছিল, তখন দেশীয় রাজ্যের রাজারা এই বিদেশী শক্তির পায়ে মাথা নত করিয়া ক্ষান্ত হয় নি, তারা এই শক্তির হুকুমে ভারতের বিদ্রোহী সাধারণ মানুষের সংগ্রাম-শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। তার অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে প্রত্যেকটি বিদ্রোহের মধ্যে।

কিন্তু এত করিয়াও যখন ঐ সকল দেশীয় রাজ্য ইংরেজ রাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল থেকে রক্ষা পাইল না, তখন এই সকল রাজা-মহারাজরা তাদের পুরাতন স্বেচ্ছাচারী সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শেষ চেষ্টা হিসাবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ব্যতীত অন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। চিরকালের বিদ্রোহ-বিরোধী, প্রজা-বিরোধী সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় রাজারা অবশেষে সাধারণ মানুষ-প্রবর্তিত বিদ্রোহের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য হইল।

ইংরেজ রাজের একশত বৎসরের রক্ত কলুষিত শাসন ও শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষ তখন মরিয়া হইয়া সারা ভারত জুড়ে আর একটা বিদ্রোহের আয়োজনে ব্যস্ত। ওয়াহাবী বিদ্রোহ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর একটানা চলিয়া তখন সাময়িকভাবে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেই বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানে ওখানে দেখা যায় মাত্র। এইবার এই আসন্ন গণবিদ্রোহের সঙ্গে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে একটি সম্পূর্ণ নূতন শক্তি। সেই শক্তি হইল ইংরেজরাজের ভারতীয় সিপাহী। ভারতীয় সিপাহীরা পেটের দায়ে বিদেশী ইংরেজ শাসকদের চাকরি গ্রহণ করিলেও তাহারা কোন দিনই জনসাধারণের উপর এই বিদেশীদের বর্বরসুলভ অত্যাচার মানিয়া লয় নাই। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করিতে বার বার অস্বীকার করিয়া তাহারা প্রমাণ করিয়াছে যে, পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করিলেও তাহারা মনে প্রাণে বিদ্রোহী জনসাধারণেরই পক্ষে। ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম তাহাদের মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ভারতীয় সিপাহীরা কৃষকের সন্তান। তাই ভারতের কৃষক যখন ইংরেজ রাজের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তা ভারতের কৃষকের সিপাহীর বেশধারী সন্তানগণ সহ্য করে নাই। তাহারাও ভারতের বিদ্রোহী কৃষক জনগণের পাশে আসিয়া তাহাদের বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। তাহাই হইল এই বিদ্রোহের মূল ভিত্তি। এছাড়া, ইংরেজ শাসকদের দুর্ব্যবহার, ইংরেজ সৈন্য ও সিপাহীদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য, বেতনের পার্থক্য, সিপাহীদের শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা, ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার যুদ্ধে সিপাহীদের বলপূর্বক ভারতের বাহিরে পাঠাইবার চেষ্টা প্রভৃতি সিপাহীদের মধ্যে দীর্ঘকাল হইতে ধূমায়িত অসন্তোষ বিদ্রোহের দাবাগ্নিতে পরিণত হইবার পক্ষে ইন্ধন যোগাইল। এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। হাতে অস্ত্র

ছিল বলিয়াই ইংরেজ রাজের বেতনভুক সিপাহীরা রইল তাদের সম্মুখভাগে, আর কৃষক জনগণ রইল তাহাদের ঠিক পিছনেই।

এই বিদ্রোহের নাম যাহাই দেওয়া হোক না কেন, এ কেবল ইংরেজ রাজের সৈন্যদলভুক্ত সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়। **এই বিদ্রোহ বিদেশী ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে সারা ভারতের গরীব জনসাধারণের মহাবিদ্রোহ।** এই বিদ্রোহে যে বাহিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, সেই বাহিনীর সিপাহী কেবল ইংরেজ রাজের সৈন্যদলভুক্ত সিপাহী নয়, সারা ভারতের কৃষক জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহী বাহিনীর (অর্থাৎ কৃষকের) একটি অংশমাত্র। তাহারাও ইংরেজ রাজের সামরিক পোশাকে ভারতীয় কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। এই বিদ্রোহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক জনগণ যে এক বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই যে এই সংগ্রামের প্রাণশক্তিরূপে কাজ করিয়া এই বিদ্রোহকে অর্ধ-ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি কোণে ছড়াইয়া দিয়াছিল, তা গ্রামবাসী কৃষক জনগণের উপর ইংরেজদের ভয়াবহ অত্যাচারের বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়। বহু ইংরেজ ঐতিহাসিক সেই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর এক নূতন শক্তি আসিয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এই নূতন শক্তি ভারতের বহু রাজ্যহারা সামন্তরাজ। তখন তাহাদের রাজ্য ইংরেজরাজের অধিকারভুক্ত। তাহারা এতদিন কৃষক জনসাধারণের সর্বস্ব শোষণ করিয়া আসিয়াছে; দলিত, পিষ্ট কৃষকের মুমূর্ষ দেহের উপর বিলাসের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। আজ তাহারা রাজ্য হারাইয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই কৃষক জনসাধারণের সহিত বিদ্রোহে যোগদান করিতে আসিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কৃষক জনসাধারণের উপর হইতে ইংরেজ জমিদার-রাজা মহারাজদের অত্যাচার ও শোষণের অবসান করা নয়, তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ রাজশক্তির কাছ হইতে তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়া। যে সামন্তরাজ ও জমিদার গোষ্ঠী সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল দিয়াই বিদেশী ইংরেজদের সাহায্য করিয়াছে, তাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য ইংরেজদের কাছ হইতে ফিরিয়া পাইবার জন্য, নিজ রাজ্যের কৃষক জনসাধারণকে শোষণ করিবার শাশ্বত অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।

এই সামন্ত-রাজগণ আসিয়াই নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিদ্রোহের নেতৃত্ব হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল। কারণ, তাহারা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আপাতত ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইলেও একদিন এই বিদ্রোহ ভারতের সামন্ত রাজগণের উপরও প্রচণ্ড আঘাত হানিবে।

ভারতীয় কৃষকদের এই বিদ্রোহ সমস্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেও এই বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য কৃষকদের নিজস্ব কোন সচেতন নেতৃত্ব গড়িয়া ওঠে নাই অথবা উন্নত বিপ্লবী চেতনা বিদ্রোহীদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। তখনকার সমাজের স্তরে তা ছিল অসম্ভব। সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও তার বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়িয়া না ওঠা পর্যন্ত তাহার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। তাই এই অর্ধচেতন বিদ্রোহী কৃষকের

উপরে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সামন্তরাজাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। এইভাবে সামন্তরাজারাই হইয়া বসিল বিদ্রোহের নেতা। এই দুই পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার ফলে, বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িলেও এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণের সূচনা করিলেও, একটি সম্পূর্ণ নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়া যাইলেও—প্রথম থেকেই এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার কিছুকাল আগে হইতেই ভারতের কৃষক অনিবার্য ধ্বংস হইতে বাঁচিবার জন্য বিদেশী ইংরেজরাজকে একটা চরম আঘাত দিবার আয়োজন করিয়াছিল। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া চলিবার পর ওয়াহাবী বিদ্রোহ তখন সাময়িকভাবে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে কৃষকদের উপর শোষণ ও উৎপীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই আবার বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত কৃষক জনসাধারণ আবার আশায় বুক বাঁধিল। তাহারা উৎসাহের সঙ্গে বিদ্রোহ সফল করিয়া তুলিবার আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের সেই উৎসাহ কমিয়া আসিল বিদ্রোহের নেতৃত্বের দিকে তাকাইয়া। তাহারা দেখিল, তাহাদের শোষকেরাই এই বিদ্রোহের পরিচালক। আর পরিচালকগণ চাহিলেন, এই বিদ্রোহকে কেবলমাত্র তাহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সিপাহীদের ও রাজা-মহারাজদের অনুগৃহীত অনুচরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে। এই সকল কারণে 'বিদ্রোহ' বিস্তৃত জনগণের সমর্থন হারাইয়া শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এখানেই দেখা দিল বিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্বলতা।

কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও যেখানেই সম্ভব হইল সেখানেই কৃষকগণ ইংরেজদের আঘাতে আঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, ইংরেজদের ঘৃণিত শাসন অচল করিয়া দিয়াছে। সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সারা ভারতে সিপাহী ও কৃষক জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই ফলে ইংরেজ শাসনের অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল। অত্যাচারী ইংরেজ সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল যে, তারা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিলেও ভারতের বিদ্রোহী মানুষ কোনদিন তাহাদের পায়ে মাথা নত করে নাই, অথবা তাহাদের শাসন মানিয়া লয় নাই। তাহারা সেদিন বুঝিয়াছিল যে, বিদ্রোহী ভারত চিরদিন একটা ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির মত মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে, সুযোগ পাইলেই সেই আগ্নেয়গিরির গহ্বর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবে গণ-বিদ্রোহের অগ্নিপ্রবাহ, আর সেই অগ্নিপ্রবাহে প্লাবিত হইয়া ভারতের ইংরেজ শাসন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

* * *

সিপাহীদের ব্যারাকে ব্যারাকে, চাষীদের গ্রামে গ্রামে গোপন সভায় স্থির হইয়াছিল, বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। এই তারিখটির পিছনে লুকাইয়াছিল ভারতের চরম দুঃখ-লাঞ্ছনার এক বেদনাময় ইতিহাস। পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছিল ঠিক একশত বৎসর পূর্বে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। ভারতের মানুষ কোনদিন ঐ তারিখটি ভুলিয়া যায় নাই, আর ভোলে নাই তাহাদের শত্রুকেও। সেইজন্য প্রতি বৎসর ঐ তারিখে গ্রামে গ্রামে সভা

বসিত, বৎসরের ঠিক সেইদিন পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করিত। সিপাহীদের ব্যারাকে গোপন বৈঠক বসিত। তাহারাও প্রতি বৎসর নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিত—পলাশীর যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ চাই।

বিদ্রোহের তারিখ স্থির হইল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। ঐদিন পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী। ঐদিন ভারতের সর্বত্র একযোগে সিপাহী ও জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ, ব্যারাকে ব্যারাকে সিপাহীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইল।

ভারতে তখন ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার, আর ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যা দুই লক্ষ পনের হাজার। তাই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সামান্য আঘাতেই ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই ধারণা লইয়াই প্রথমে নেতারা বিদ্রোহের আয়োজন আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্রোহের আয়োজন ও সংগঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ কোথা হইতে আসিবে? বিদ্রোহের নেতারা হলেন রাজ্যহারা সামন্ত-রাজা। তাঁরা অর্থের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না। সিপাহীদের অর্থের প্রয়োজনে বিদ্রোহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত বাদশাহ বাহাদুর শাহ জবাব দিলেন, 'আমার কোষাগার নেই; আমি তোমাদের বেতন দিতে পারিব না।'

আসন্ন বিদ্রোহ ও মুক্তির আনন্দে আত্মহারা সিপাহীরা জবাব দিল, 'আপনার চিন্তার কারণ নেই; আমরা ইংরেজ রাজের কোষাগার হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া অর্থ আনিয়া দিব। তা দিয়াই চলিবে আমাদের বিদ্রোহের আয়োজন।'

বিদ্রোহের নেতারা স্থির করিলেন, ভারতের সকল সিপাহী একই দিনে বিদ্রোহ করিয়া ভারতের সকল ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করিবে, জেলের দরজা ভাঙ্গিয়া বন্দীদের মুক্ত করিবে, সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করিবে, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলিবে, রেল লাইন তুলিয়া ফেলিবে এবং ইংরেজদের অস্ত্রাগার ও তাহাদের অধিকৃত দুর্গসমূহ দখল করিবে। এই সব কাজ শেষ হইয়া গেলে, প্রয়োজন হইলে জনসাধারণকে বিদ্রোহে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। এইভাবে বিদ্রোহে জনসাধারণের কর্তব্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

বিদ্রোহের পরিচালকগণ এও স্থির করিলেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করা হইবে। সামরিক পরামর্শদাতারা যুক্তি দিলেন, ইংরেজ সেনাবাহিনী সুশৃংখল ও অভিজ্ঞ বলিয়া যুদ্ধের সময় তাহাদের সম্মুখীন হওয়া উচিত হইবে না। শত্রুদের বহু কামান রহিয়াছে, কামানের বিরুদ্ধে কামান ব্যতীত সম্মুখ যুদ্ধ করা চলিবে না। সুতরাং ইংরেজ বাহিনীকে পিছন হইতে আঘাত করিতে হইবে এবং তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।

বিদ্রোহের নায়কগণ ইংরেজদের যুদ্ধ-কৌশল উত্তমরূপে বুঝিবার এবং আয়ত্ত করিবার জন্যও চেষ্টা করিবেন। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গদিচ্যুত মারাঠা নেতা, পেশোয়া নানাসাহেব এইজন্য বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা আজিমুল্লা খাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। নানাসাহেবের পরামর্শে আজিমুল্লা ভারতের প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যলাভের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। এইভাবে সবদিক হইতে বিদ্রোহ

সফল করিয়া তুলিবার আয়োজন করা হইল।

বিদ্রোহের আয়োজন দ্রুত চলিতে লাগল। সকলের মুখেই এক কথা—২২শে জুন। সিপাহীরা বিদ্রোহের নেশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তখন মার্চ মাস।

একদিন আকস্মিকভাবে একটি ঘটনা ঘটিল। সেই ঘটনা হইতেই সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জুন মাস পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা সিপাহীদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না।

মার্চ মাসে একদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতার নিকটস্থ ব্যারাকপুরের সৈন্য-ব্যারাকে দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিদের এক বৈঠক চলিতেছিল। সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ব্যারাক পরিদর্শন করিতে আসিল। অন্য সিপাহীরা তখন অবসর সময়ে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। তাহারা ইংরেজ কর্মচারীটিকে দেখিয়াও দেখিল না। কর্মচারীটি ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ এক সিপাহীকে ঘুসি মারিল। এই আকস্মিক আক্রমণে সেই সিপাহী আহত হইল এবং এর ফলে অন্যান্য সিপাহীরা ভীষণ ক্ষিপ্ত হইল। মঙ্গল পাণ্ডে নামক বাহিনীর একজন সৈনিক অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীটিকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। ইংরেজ কর্মচারীর নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়া পড়িল।

এই সংবাদ শোনামাত্র এই অঞ্চলের সকল ইংরেজ সৈন্য তাড়া করিয়া আসিল দেশীয় সিপাহীদের শাস্তি দিতে। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করা হইল। এর সাতদিন পর মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসীকাষ্ঠে হত্যা করা হইল। এই ফাঁসির সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সিপাহীরা বীর মঙ্গল পাণ্ডের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই ঘটনা হইতেই আরম্ভ হইয়া গাইল ভারতের যুগান্তকারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান বা 'মহাবিদ্রোহ'.

এই সময়ে ছোট একটি দেশীয় সৈন্যদল ছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। তাহারা মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির সংবাদ শুনিয়াই ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষক ও জনসাধারণের সঙ্গে সিপাহীদের কোন যোগাযোগ না থাকায় এবং বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণী এই অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করায় কৃষক ও জনসাধারণ এই বিদ্রোহ হইতে দূরে রহিল। বাংলাদেশের এই সিপাহী বিদ্রোহ প্রধানত ব্যারাকপুর ও বহরমপুর—এই দুইটি শহরের ঘটনা হইয়া রহিল। এই দুই শহরের সংখ্যাল্প সিপাহীরা কয়েকদিন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেও গণ-সাহায্য না পাইয়া পরাজিত ও বন্দী হইল। চট্টগ্রামে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া নোয়াখালি ও আসামে ছড়াইয়া পড়িল এবং কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে চূড়ান্তরূপে পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইল। এইভাবে বঙ্গদেশে বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

কিন্তু ব্যারাকপুরের ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মীরাটের সব ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করিল। এরপর মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এদিকে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিল্লী অভিযান করিল। স্থানীয় কৃষকরা তাহাদের সঙ্গে বিদ্রোহে

যোগদান করিয়া রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, টেলিগ্রাফের লাইন কাটিয়া এবং ইংরেজ সৈন্যদের ব্যারাক ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

এই বিদ্রোহের সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন-হারা মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল। দিল্লীর সিপাহীরা ও মুসলমান জনসাধারণ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া মানিয়া লয়। তখন হইতে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ হইলেন বিদ্রোহের প্রধান পরিচালক ও কেন্দ্রস্বরূপ। এইভাবে বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে এই অভ্যুত্থান সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া তুলিল।

জুন মাসে কানপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কানপুরের সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন গতিচ্যুত পেশোয়া নানাসাহেব। কানপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। নানাসাহেবের সাথে যোগ দিলেন গদিচ্যুত অযোধ্যার বেগম ও সম্পত্তিহারা জায়গীরদারগণ। তাঁহাদের যোগদানের ফলে এই অঞ্চলের বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল ঝাঁসীর গতিচ্যুত-রানী লক্ষ্মীবাঈ। রানী নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করিল। বিহারের কুমার সিংহ নামে একজন জায়গীরদার পাটনার বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। শোলাপুর এবং কাল্পী নামক মধ্যপ্রদেশের একটি দেশীয় রাজ্যের রাজাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করিল।

এইভাবে সিপাহী বিদ্রোহ বাংলাদেশের ব্যারাকপুর হইতে আরম্ভ হইয়া দ্রুত বহরমপুর, আম্বালা, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, রুড়কি, কাশী, আজমগড়, জৌনপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, ফতেপুর, বিথুর, মিয়ামী, ফিরোজপুর, গোবিন্দপুর, পেশোয়ার, ঝিলাম, শিয়ালকোট, পাটনা, দানাপুর, আরা, জগদীশপুর, আটক, মৈনপুর, সাহারানপুর, বদায়ুন, ইন্দোর, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িল।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণও সকল শক্তি লইয়া তাতে যোগদান করিল। সেই সময় ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবীদের মধ্যেও আবার উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তাহারা সিপাহীদের সঙ্গে একযোগে সাধারণ শত্রু ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে আঘাত হানিতে আরম্ভ করিল।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের জনসাধারণ এবং কৃষকগণও তাহাতে যোগদান করিল। যেসব অঞ্চলের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, সেইসব অঞ্চলের কৃষকেরা নিজে থেকেই রেল লাইন তুলিয়া ফেলিল, টেলিগ্রাফের তার কাটিল, ইংরেজ সৈন্যদের ব্যারাক জ্বালাইয়া এবং তাহাদের রসদ লুঠ করিয়া ইংরেজ বাহিনীকে অচল করিয়া দিয়াছিল। বিদ্রোহের নায়কগণ কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদানের জন্য আহ্বান না করিলেও, তাহারা নিজে হইতে এগিয়ে আসিয়া শত্রুর পশ্চাতে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালাইল। কিন্তু তাহারা যতই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল যে, তাহাদের আর এক শত্রু, অর্থাৎ পুরাতন সামন্ত-রাজগণ কেবল নিজেদের স্বার্থেই এই

বিদ্রোহ পরিচালনা করিতেছে, ততই তাহাদের উৎসাহ হ্রাস পাইতে থাকে। এর ফলে, এই বিদ্রোহ ক্রমশ ব্যাপক গণবিদ্রোহের রূপ গ্রহণ না করিয়া ধীরে ধীরে গণ-সমর্থন হারাইয়া ফেলিতে থাকে।

* * *

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে নানাসাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপী ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভলকের কাছে পরাজিত হন। সেনাপতি হ্যাভলক কানপুর দখল করিল। তিন মাসের অবরোধের পর সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ বাহিনী সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকট হইতে দিল্লী অধিকার করিল। সেনাপতি হ্যাভলক ও আউটরাম একত্রে লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করিল। লক্ষ্ণৌ ইংরেজ বাহিনীর হস্তগত হইল।

এই আশাতীত জয়লাভে ইংরেজরা বর্বর উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। তাহারা যেসব শহর অধিকার করিল, সেই শহরের প্রত্যেক অধিবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া বিদ্রোহের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে থাকে। দিল্লী অধিকার করিবার পর ইংরেজ সৈন্য পাঁচ দিন ধরিয়া রাজপথে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক যাহাকে পাইল—তাহাকেই গুলি করিয়া হত্যা করিল। মুমূর্ষ সিপাহীরাও তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। ইংরেজদের কাছ হইতে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাইয়া ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেও ইংরেজ সৈন্যগণ তাঁহাদের হত্যা করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলাইয়া রাখিল। দিল্লী নগরীতে প্রায় ছয় হাজার নরনারী এইভাবে নিহত হইল।

* * *

ইংরেজদের এই পৈশাচিক তাণ্ডব শীঘ্রই বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের ফলে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীরা প্রাণপণ চেষ্টায় আবার একত্রিত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের উপর আক্রমণ করিল। কানপুরের যুদ্ধের পরাজয়ের পর নানাসাহেব একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অযোধ্যার ইংরেজ বাহিনীর উপর আক্রমণ করিল। নানাসাহেবের বাহিনী লক্ষ্ণৌ-এর পথে সেনাপতি হ্যাভলকের বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কানপুর পুনর্দখলের জন্য যাত্রা করিল। তাঁহার সঙ্গে তাঁতিয়া তোপীর বাহিনী যোগদান করিয়া বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। দুইজনে একত্রে কানপুর দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর এই জয়লাভের সংবাদে আবার সারা ভারতের বিদ্রোহীদের মধ্যে উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

এদিকে ইংরেজদের আক্রমণে ঝাঁসীর রানীর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। এই সংবাদ শুনিয়া রানীকে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিল তাঁতিয়া তোপীর সৈন্যবাহিনী। কিন্তু রানী ও তোপীর মিলিত বাহিনী ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কানপুর পৌঁছাইবার পূর্বে নানাসাহেবের বাহিনী ইংরেজদের বাধা দিয়া থাকে। কিন্তু নানার বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এরপর নানাসাহেবের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে ঝাঁসীর রানী ও তাঁতিয়া ঝাঁসির নিকটবর্তী কোন স্থানে দাঁড়াইতে না পারিয়া এক নূতন পরিকল্পনা স্থির করিল। তাঁহারা গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়া

তাতে আশ্রয় গ্রহণের সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইল। গোয়ালিয়রের রাজা সিন্ধিয়া ছিলেন ইংরেজদের পক্ষে। রানী ও তোপীর মিলিত বাহিনীর নিকট সিন্ধিয়া পরাজিত হইল। বিজয়ী বাহিনী গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করিল।

ইংরেজরা এই সংবাদে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিল। দুর্গের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে রানী লক্ষ্মীবাঈ নিহত হইলেন এবং দুর্গের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তোপী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। পলায়নের পথে তোপীর বাহিনীর সাথে ইংরেজদের চারবার যুদ্ধ হইল। কিন্তু প্রত্যেকটি যুদ্ধে তোপীর বাহিনী পরাজিত হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। এরপর তোপীর এক অনুচর সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় তোপীকে ইংরেজদের হস্তে ধরাইয়া দেয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ইংরেজরা তোপীকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করিল। এই চরম সংকটের সময় বিদ্রোহের প্রধান পরামর্শদাতা আজিমুল্লা খাঁ ফল-বিক্রেতার ছদ্মবেশে লক্ষ্ণৌ দুর্গে ঘোরাফেরা করিবার সময় একদিন ধরা পড়িয়া যান। ইংরেজরা তাঁকেও গুলি করিয়া হত্যা করিল।

কুমার সিংহের নেতৃত্বে পাটনা, আরা ও দানাপুরের বিদ্রোহীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা পাটনায় ইংরেজদের কোষাগার ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিল এবং পাটনার জেলখানা হইতে হাজার হাজার কয়েদীকে মুক্ত করিয়া দিল। এরপর কুমার সিংহ একদল সৈন্য লইয়া আবার দুর্গ অবরোধ করিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিল। এই দুর্গ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরা অঞ্চল বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বহু কামান, বন্দুক ও একটি বিরাট সৈন্যদলসহ একজন ইংরেজ সেনাপতি আরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর কুমার সিংহের বাহিনী পরাজিত হইল।

এই পরাজয়ের পর কুমার সিংহ আবার বিদ্রোহী সিপাহীদের সংগঠিত করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আজমগড়ের ইংরেজ সৈন্যদলকে পরাজিত করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি নূতন সৈন্যদল আসিয়া পরাজিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত মিলিত হইল। এরপর আর জয়ের আশা না দেখিয়া কুমার সিংহ সসৈন্যে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। মান্নাহার নামক স্থানে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কুমার সিংহের বাহিনী পুনর্বার পশ্চাদপসরণ করিল। এই সময় কুমার সিংহ ইংরেজদের গুলিতে গুরুতররূপে আহত হন। এরপর তাঁর ভাই অমর সিংহ বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। জগদীশপুর নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি গ্র্যাণ্ডের সৈন্য-বাহিনী বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইল। কুমার সিংহ আহত অবস্থাতেই সৈন্য পরিচালনা করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু যুদ্ধকালে একটি গুলির আঘাতে কুমার সিংহ নিহত হন। এই যুদ্ধের পর বিহারে বিদ্রোহী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এরপর ধীরে ধীরে যুদ্ধের আগুন নিভিয়া আসিল।

বৃটিশ শোষণ-শাসনের স্বরূপ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী একশত বৎসরের শোষণ-শাসনেরই চরম পরিণতি। ইংরেজ শাসকশক্তি এই একশত বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া এবং উহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্রমবর্ধমান নূতন বৃটিশ ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী শোষণের পথ প্রস্তুত করে। ইংরেজ শাসকশক্তির এই ধ্বংস-কার্যের সহিত তুলনা করা যায় এরূপ কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। যে ভারতীয় সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর কালের বৈদেশিক আক্রমণ, আভ্যন্তরিক বিপ্লব, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা মানব ইতিহাসের নূতনতম বর্বরশক্তি বৃটিশ ধনতন্ত্রের আক্রমণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ভারতের বৃটিশ শাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কস্ এই ধ্বংসের চিত্র নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

> "হিন্দুস্থানে ক্রমাগতভাবে যে সকল গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটিয়াছে, তাহা যতই অদ্ভুত জটিলতাপূর্ণ, আকস্মিক ও ধ্বংসাত্মক বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাদের প্রভাব কখনও গভীরে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের কাঠামোটাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, আর এ পর্যন্ত ইহার পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। বৃটিশ আক্রমণকারীগণ ভারতে তাঁত ভাঙিয়া ফেলিয়াছে এবং সূতা কাটিবার চরকাটি পর্যন্ত ধ্বংস করিয়াছে। বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান সমগ্র হিন্দুস্থানের বুকের উপব কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে।"[১]

ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস লো ধ্বংসকার্যের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :

> "স্পষ্টই দেখা যায়, এই দেশের ধনসম্পদের বিকাশ ও বৃদ্ধির চেষ্টার পরিবর্তে এক সহস্র বৎসরের পূর্বের ন্যায় তাহা অবহেলিত অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া ধ্বংস হইতে দেওয়া হইয়াছিল। যে দেশীয় শিল্পের জন্য ভারতের নাম পশ্চিম জগতে সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করিত, তাহা এখন অবলুপ্তির পথে। এক সময়ে সুবিখ্যাত ও বিপুলায়তন নগরগুলি এখন ধ্বংসস্তূপ মাত্র; সেই সকল স্থান এখন হায়না ও খেঁকশিয়ালের আবাস স্থলে পরিণত। ভারতের সেই সুবিখ্যাত বিদ্যাপীঠগুলি আর নাই—প্রাচ্যের সেই সুধী ব্যক্তিগণের নাম এখন কেবল রূপকথা আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ভারতের মন্দিরসমূহ, অজন্তা ও ইলোরার বিস্ময়কর গুহামন্দির ও অন্যান্য স্থানগুলি দ্রুত ধুলায় পর্যবসিত হইতেছে, শীঘ্রই সেইগুলির শেষচিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। অসংখ্য পুষ্করিণী ও সরাইখানা ধ্বংস হইতেছে। সেচকার্যের খালগুলি ভরাট হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। অসংখ্য জেলা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্যজন্তুর আবাসস্থলে পরিণত, ভয়ঙ্কর ম্যালিরিয়ার আক্রমণে বাসের অযোগ্য। ...ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস, সর্বত্র ধ্বংস, আর চরম দারিদ্র্য...সমস্ত দেশ যেন কুষ্ঠরোগে

১। Karl Marx : British Rule in India, Janu. 25, 1853 (article).

আক্রান্ত, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান।...যাহার চক্ষুকর্ণ আছে, সে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিবে না যে, আমরা (ইংরেজ জাতি—সু.রা.) এই বিশাল দেশের ধনসম্পদ সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছি, আর আমাদের দেশের শহরগুলিতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ভারতের সকল কোণ ভরিয়া দিয়াছি। মনে হয়, আমরা যেন এই প্রাচ্যদেশে উৎপন্ন সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি।"[১]

এই সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের, ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারত জুড়িয়া মহাবিদ্রোহের ঝড় উঠিয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। গো-চর্বি ও শূকর-চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের সামান্য ঘটনাটি একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সেই বারুদস্তূপে পতিত হইয়া সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপী এক প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাইল।

"রাজ্যহারা ক্ষুব্ধ রাজা ও রানীর দল, জমিদারের দল, জমি-গৃহহারা কৃষক, জীবিকার সংস্থান হইতে বিচ্যুত কারিগর ও শ্রমিক, মোল্লা-পুরোহিতের দল এই ব্যাপক বিস্ফোরণকে গ্রহণ করিল তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাইবার উপায় হিসাবে। বৃটিশ শাকসগণ ভারতে আসিবার পর এই প্রথম ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইল।"[২]

মহাবিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে উত্তর-ভারতের বহু স্থানে ইংরেজ শাসন তাসের ঘরের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। ঐতিহাসিক ফরেস্ট সাহেবের কথায় :

"মাত্র দশদিকের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের ইংরেজ শাসন সামান্য চিহ্নমাত্রও না রাখিয়া স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল।"[৩]

রাজ্যহারা রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামীগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিলেও ভারতীয় সিপাহিগণ এই মহাবিদ্রোহের পুরোভাগে থাকিবার জন্যই মহাবিদ্রোহকে "সিপাহী-বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করা হইলেও, উত্তর ভারতের কৃষক, কারিগর প্রভৃতি শ্রমজীবী জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহের মূল ও প্রাণশক্তিস্বরূপ। ভারতীয় সিপাহীরাও প্রধানত কৃষকেরই সন্তান। অযোধ্যা ও পূর্ব-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এম. আর. গুবিন্স্-এর কথায়—

"ভারতীয় সিপাহীরা ছিল প্রধানত কৃষক-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বঙ্গদেশে অবস্থিত সিপাহিগণের অধিকাংশই ছিল অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক।"[৪]

রাজ্যহারা রাজন্যবর্গ ও সম্পত্তিহারা ভূস্বামীগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনন্যোপায় হইয়াই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

১। Thomas Lowe : Central India During the Rebellion of 1857-58 p. 24.

২। Talmiz Khaldun : The Great Rebellion (Symposium).

৩। G. W. Forrest : History of the Indian Mutiny. vol. 1. p. 217.

৪। M. R. Gubins : An Account of the Mutinies in Oudh. p. 59.

বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। নানা সাহেবের উক্তি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। বিদ্রোহের শেষে বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নানা সাহেব ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট, ইস্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানি'র 'বোর্ড-অফ-ডাইরেক্টরস্', ভারতের গভর্নর-জেনারেল প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :

ইহা অত্যন্ত "অদ্ভুত" ও "বিস্ময়কর" যে, "যাহারা প্রকৃত হত্যাকারী তাহাদিগকে তাঁহারা (কর্তৃপক্ষ—সু.রা.) মার্জনা করিয়াছেন," কিন্তু সে (নানা সাহেব—সু. রা.) "নিতান্ত অসহায় অবস্থার চাপে বিদ্রোহ যোগদান করিতে বাধ্য হইলেও" তাহাকে মার্জনা করা হইল না।[১]

ইহাও ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় যে, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহের প্রথম ভাগে ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীকে রসদ যোগাইয়া এবং যুদ্ধে আহত ইংরেজ সৈন্যদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়াও যখন ইংরাজ শাসকদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই, কেবল তখনই ঝাঁসী রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন।[২]

কৃষক-সন্তান সিপাহিগণ ব্যতীত জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষক-সম্প্রদায় যে এই মহাবিদ্রোহে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সমসাময়িক কালের বহু ইংরেজ শাসক ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এই সম্পর্কে কতিপয় উক্তি ও তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(১) "বহু স্থানে সিপাহিগণ তাহাদের ব্যারাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার পূর্বেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।"[৩]

(২) ঐতিহাসিক কে (Kaye) তাঁহার গ্রন্থে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে "হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই।"[৪]

(৩) ঐতিহাসিক ম্যালেসন্‌ও স্বীকার করিয়াছেন যে, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড এবং সগর ও নর্মদা—উত্তর-ভারতের এই চারিটি প্রদেশে "জনসাধারণের প্রায় সকল অংশই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। বিহারের পশ্চিম ভাগে এবং পাটনা বিভাগের বহু জেলায়, আগ্রা এবং মিরাট অঞ্চলে সিপাহিগণ ও জনসাধারণ একই সময় অভ্যুত্থান আরম্ভ করিয়াছিল।"[৫]

(৪) ঐতিহাসিক লো'র মতে, শিশুহত্যাকারী রাজপুত, গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ধর্মোন্মাদ মুসলমান, বিলাসপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহারাষ্ট্রীয়...সকলে একই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল; গো-হত্যাকারী ও গো-পূজারী, শূকর-ঘৃণাকারী ও শূকর খাদক,

১। Political Proceedings. nos. 63-70. May 27. 1859, K. W. 63.
২। Political Proceedings. No. 280. Dec. 30. 1859.
৩। Quoted from Oxford History of India. p. 722.
৪। John Kaye : History of the Sepoy War in India. Vol. II. p. 195.
৫। Malleson : History of the Indian Mutiny. Vol. III, p. 487.

'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' ঘোষণাকারী[১] এবং ব্রহ্মের অজ্ঞেয়তা সম্বন্ধীয় মন্ত্রোচ্চারণকারী[২]—সকল মানুষ একত্রিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।"[৩]

(৫) "মীরাট ও আলিপুরের জনসাধারণ ব্যারাকের সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে যোগদান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা কারীদিগকে একঘরে করিয়া রাখা হইয়াছিল। যে সকল স্থানের জনসাধারণ অভ্যুত্থানে যোগদান করিতে সাহসী হয় নাই, সেস্থানেও তাহারা ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়াছিল। জেনারেল হ্যাভ্‌লক তাঁহার সৈন্যবাহিনীর নদী পারের জন্য একখানি নৌকা বা একজন মাঝিও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কানপুরে ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ যাহাদের বলপূর্বক শ্রমিকের কার্যে নিযুক্ত করিত—তাহারা সকলেই রাত্রিকালে পলায়ন করিত। যে সকল স্থানে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল সেই সকল স্থানেই জনসাধারণ স্বাধীনতা বক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।"[৪]

(৬) এমন কি পাঞ্জাবের জনসাধারণ অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহ যোগদান না করিলেও সেখানে "ধনী মহাজন হইতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর্যন্ত, সবকারী ঠিকাদার হইতে কুলি-মজুর পর্যন্ত—সকল মানুষ ইংরেজ সরকারের সহিত সহযোগিতা না করিয়া দূরে দণ্ডায়মান ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর পতনের পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাব হইতে কোন প্রকারের সাহায্য, কোনও রসদ পাওয়া যায় নাই।"[৫]

(৭) কৃষকগণ স্বেচ্ছাসেবকরূপে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের কোন সামরিক শিক্ষা না থাকলেও তাহারা যেরূপ বীরত্বের সহিত এবং নিপুণভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বৃটিশ সেনা-নায়কগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের মধ্যবর্তী মিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্রোহীদের আট হাজার সৈন্যের মধ্যে এক হাজার ছিল সিপাহী এবং বাকি সাত হাজার ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কৃষক।[৬] একই সময়ে সুলতানপুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বিদ্রোহীপক্ষের পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং এগারো শত অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে সিপাহীদের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার, বাকি সকলেই ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের কৃষক।[৭]

(৮) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকারের পর লক্ষ্ণৌ অধিকারের জন্য বিশাল বৃটিশ বাহিনী সমবেত হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সমস্ত কৃষক জনতা লক্ষ্ণৌ শহরে সমবেত হইয়াছিল এবং যুদ্ধ করিয়া অগণিত সংখ্যায়

১। মুসলমানগণ।

২। ব্রাহ্মণগণ।

৩। Thomas Lowe : Central India During the Rebellion of 1857-58. p. 24.

৪। Quoted from the artical 'The Great Rebellion' by Talmiz Khaldun (Symposiun).

৫। Rev. J. Cave-Brown : The Punjab & Delhi in 1857. Vol. I. p. 28-29.

৬। Malleson : Ibid Vol. III. p. 287.

৭। Malleson : Ibid Vol. II. p. 334.

প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। ঐতিহাসিক চার্লস বল্-এর কথায় :
"সমস্ত গ্রামাঞ্চল হইতে অগণিত সংখ্যায় সশস্ত্র কৃষকগণ লক্ষ্ণৌ শহরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ফিরিঙ্গিদের সহিত মৃত্যুপণ যুদ্ধে সকলেই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল।"[১]

(৯) মীরাটের গ্রামাঞ্চলের গুজর, রঙ্গুর, জাট প্রভৃতি কৃষিজীবী-সম্প্রদায় বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এই অঞ্চলে শা মল নামে একজন সর্দার এই অঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শা মল তাঁহার অনুচরগণকে লইয়া যমুনা নদীর উপরিস্থিত নৌকা-সেতুটি ধ্বংস করিয়া বৃটিশ বাহিনীর যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শা মলের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী উপজাতীয় কৃষকগণের নিকট বহু খণ্ডযুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যদলগুলিকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।[২]

(১০) দক্ষিণ হামিরপুর অঞ্চলে "বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল বিদ্রোহী কৃষকদের দ্বারা জেলার সকল জমির দখল হইতে গ্রাম্য বেনিয়া, মারোয়াড়ী প্রভৃতিদের উচ্ছেদ সাধন।"[৩]

(১১) "সমগ্র বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ তরবারি ও 'ম্যাচ্‌লক্' বন্দুকের অভাব দেখা দিয়াছিল। সুতরাং কৃষকগণ বল্লম ও কাস্তে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে। তাহারা লোহাবাঁধান লাঠি এবং লাঠির সহিত কষাইয়ের ছুরিকা বাঁধিয়া অস্ত্র তৈরী করিয়া লয়। তাহারা নিজেদের একজন রাজা নির্বাচিত করিয়া সকল সরকারী আদেশ ও সরকারী কর্মচারীদের অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। আর কোন বিপ্লব এরূপ দ্রুত বিস্তার বা এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই।"[৪]

(১২) "বিদ্রোহে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের যোগদানের ফলে অধিকাংশ বিদ্রোহীদের বাছিয়া বাহির করিতে না পারিয়া ম্যাজিস্ট্রেটগণ সকল গ্রাম অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, গ্রামাঞ্চলের সকল মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।"[৫]

মহাবিদ্রোহে কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করা চলে :

প্রথমত, ইংরেজ শাসকগণ যে নূতন ভূমি-ব্যবস্থা কৃষকের মাথার উপর চাপাইয়া দিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের সমগ্র কৃষক জনসাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম-পদ্ধতি ছিল ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন জমিদারগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধন, জমির উপর সেই জমিদারগোষ্ঠীর অধিকার-সম্বলিত দলিল-পত্রের ধ্বংসসাধন,

১। Charles Ball : Indian Mutiny. Vol. II. p. 241.
২। Narrative of Events. No 406 of 1858 by Commissioner F. Williams. dt. 15/11/1858.
৩। Ibid. by G. H. Freeling.
৪। Ibid. by F. D. Mayne. dt. 4/9/1898.
৫। R C. Mazumder : The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857. p. 217.

গ্রাম হইতে তাহাদের বিতাড়ন, তাহাদের ভূ-সম্পত্তি দখল, এবং থানা-কাছারী, তহসিল[১] প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের সকল প্রতীক-চিহ্নের ধ্বংসসাধন।

তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামের প্রধান শক্তি ছিল কৃষক জনসাধারণ ও দরিদ্র কৃষক, আর সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল ইংরেজদের নূতন আইনের ফলে ভূ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত জমিদারগণের হস্তে।

চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলের সংগ্রাম-পদ্ধতি ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম সমগ্র জমিদার-শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত না হইয়া জমিদার-শ্রেণীর একটি অংশের বিরুদ্ধে, যে জমিদারগণ ইংরেজ শাসনের নূতন ভূমি-আইনের ফলে সৃষ্ট হইয়া ইংরেজ শাসকগণের রাজনৈতিক সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে। ইহা সাময়িকভাবে হইলেও, দৃঢ় জাতীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল।

গণ-শাসনের রূপ

মূল চরিত্রের দিক হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহবিদ্রোহ ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন ও গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভারতীয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের কথায় :

> "ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক কারণসমূহ সিপাহীদেব অতি সাধারণ একটা বিদ্রোহকে উত্তর ও মধ্য-ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে এবং এই বিদ্রোহকে সশস্ত্র রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পরিণত হইতে সাহায্য করিয়াছিল।"[২]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ছিল উত্তর ও মধ্য-ভারতের জনসাধারণেব শাসন ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম। সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণাকে জনসাধারণ সংগ্রাম আরম্ভের ইঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সমসাময়িক কালের জনৈক জেলা শাসকের কথায় :

> "অভ্যুত্থান আরম্ভের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর-ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।"[৩]

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর-ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান জনসাধারণের অভ্যুত্থানের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

অভ্যুত্থানের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এবার আরম্ভ হইল স্বাধীন ভারতের গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজন্যবর্গ, ভূস্বামী-গোষ্ঠী প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদঘাটিত হইল।

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-বিরোধী শ্রেণীর ঐক্যে ভাঙন দেখা দেয়। বৈদেশিক শাসনের প্রতি ঘৃণা বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ

১। রাজস্ব সংগ্রহের কার্যালয়।

২। R. C. Datta : The Economic History of India. Vol. II. p. 223.

৩। Mark Thornhill : the Personal Adventures & Experiences of a Magistrate during the Rise & Progess & Suppression of the Mutiny. p. 178.

করিয়াছিল, কিন্তু সহজলব্ধ সাফল্যে উল্লসিত হইয়া এবার বিভিন্ন শ্রেণী নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় সেই ঐক্য ভাঙিয়া পড়ে। অভ্যুত্থানের হিন্দু-মুসলমান কর্ণধারগণ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কেই ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করায় মোঘলদের প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। মোঘল-মহারাষ্ট্রীয় পূর্বদ্বন্দ্ব আবার দেখা দিতে থাকে।

সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীগণ "তাহাদের জমিদারীতে নিরঙ্কুশ শোষণ ও শাসনের অধিকার" ফিরিবার আশায় অভ্যুত্থানে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের পর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দ্রুত তাহাদের হস্তচ্যুত হইতে দেখিয়া তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। সমসাময়িক কালের Calcutta Review পত্রিকার জনৈক লেখকের কথায়,—

> "রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামীগণের অনেকেই শীঘ্র বুঝিতে পারিল যে, এইরূপ একটি নিষ্ফল যুদ্ধে উচ্চ শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীসমূহের অভ্যুত্থানে তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না।"[১]

রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামীগণের এই ধারণা যে নির্ভুল তাহা বিদ্রোহের জন-নায়কগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন ভারতের শাসন-কার্য ও সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি 'রাষ্ট্রীয়-সভা' (Court of Administration) গঠিত হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয়-সভা গঠিত হইয়াছিল বিভিন্ন সামরিক বিভাগের সিপাহী ও বে-সামরিক কর্মচারীগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া। *পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ* বাহিনী—এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতে দুইজন এবং বে-সামরিক কর্মচারীদের চারিজন প্রতিনিধি লইয়া রাষ্ট্রীয়-সভা কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রতিনিধিগণ সকলেই নিজ নিজ বিভাগ হইতে সংখ্যাধিক ভোটে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আবার সংখ্যাধিক ভোটে একজন সভাপতি (সদর-এ-জলসা) এবং একজন সহকারী সভাপতি (নায়েব সদর-এ-জলসা) নির্বাচিত করিয়াছিলেন। সভায় সকল সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইত।

রাষ্ট্রীয়-সভাই সর্বোচ্চ বিচার-সভারূপেও কার্য করিত। ইহা আবার বিভিন্ন আদালত স্থাপন করিয়া সেইগুলির জন্য বিচারক নিয়োগ ও বিচারপদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছিল। রাষ্ট্রীয়-সভা কঠোর হস্তে সকল দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। অতি সাধারণ মানুষও কোন অন্যায়-অবিচারের জন্য রাষ্ট্রীয় সভার নিকট আবেদন করিতে পারিত এবং অন্যায়কারী যত উচ্চপদস্থই হোক না কেন, তাহাকে আদালতের বিচার মানিয়া লইতেই হইত।

রাষ্ট্রীয়-সভা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে বাহাদুর শাহ্‌কেই ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু জুলাই মাসেই ইহা সম্রাটের সকল ক্ষমতা হরণ করিয়া লয় এবং

১ Calcutta Review 1858 p. 65.

একটি 'পরোয়ানা'[১] জারি করিয়া নূতন ভারত-রাষ্ট্রের রূপ ব্যাখ্যা করে। এই নূতন 'পরোয়ানা'য় বাহাদুর শাহ্‌কেই ভারত সম্রাট বলিয়া পুনরায় ঘোষণা করা হইলেও রাষ্ট্রীয়-সভার হস্তেই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। আবার 'পরোয়ানা'য় বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মির্জা মোগলকে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও যুদ্ধ পরিচালনার সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রীয়-সভার হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

রাষ্ট্রের শাসন-কার্য পরিচালনা, অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, জেলা ও মহকুমা হইতে রাজস্ব আদায়, মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ পরিচালনা—এইগুলিই ছিল রাষ্ট্রীয়-সভার প্রধান কার্য। এই সভার সিদ্ধান্ত ও কার্য-পরিচালনার উপর সম্রাট বাহাদুর শাহের কোন কর্তৃত্ব চলিত না।[২]

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের পরেই অভ্যুত্থানে যোগদানকারী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিতে থাকে। এমন কি, সম্রাট বাহাদুর শাহের বেগম জিনৎ মহল, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র (বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি) মির্জা মোগল, প্রধানমন্ত্রী আশানুল্লা এবং মোগল সম্রাটের কর্মচারীগণও গোপনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ইংরেজ পক্ষের সহিত যোগদানের সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

ইহা বুঝিতে পারিয়া রাষ্ট্রীয়-সভা বাহাদুর শাহ্‌কে নজরবন্দী করিয়া রাখে। কারণ, সভায় পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী সম্রাটের 'দস্তক' (seal) ও স্বাক্ষর ব্যতীত রাষ্ট্রীয়-সভার কোন সিদ্ধান্তই আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারিত না। অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাহাদুর শাহের বিচারকালে তিনি তাঁহার বন্দীদশা এবং মোগল পরিবারের সহিত রাষ্ট্রীয়-সভার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন :

> "বিদ্রোহী সিপাহীগণ একটি রাষ্ট্রীয়-সভা গঠন করিয়াছে। সেই সভায়ই সকল বিষয় আলোচিত ও সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত। আমি কখনও সেই সভার অধিবেশনে যোগদান করি নাই।...যেদিন বিদ্রোহী সিপাহীরা আসিয়া যুরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করে, সেই দিন হইতে আমাকেও বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা যে দলিল-পত্র লইয়া আসিত তাহাতেই 'দস্তক' ও স্বাক্ষর দিতে আমাকে বাধ্য করিত।.. আমার জীবন বিপন্ন হওয়ায় আমি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতাম না।...আমার কর্মচারীগণ এবং আমার বেগম জিনৎ মহল ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিত। এমন কি তাহারা আমার কর্মচারীদের হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইত এবং আমার বেগমকে তাহাদের প্রতিভূরূপে অর্পণ করিবারও আদেশ দিয়াছিল।"[৩]

মোগল পরিবার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল তাহা মুমূর্ষু

১। Bundle 57. Folio No. 539-41 (Urdu). dtd. nil.
২। Bundle 153. Fo. No. 12 (Persian). Aug 19. 1857.
৩। Trial of Bahadur Shah. Ex-King's Defence Statement. p. 137-38.

অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সদ্য ও শোষণমুক্ত কৃষকশক্তির দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন মাত্র। এই দ্বন্দ্বই ক্রমশ সকল বিত্তশালী উচ্চশ্রেণীর সহিত বিদ্রোহী জনসাধারণের—কৃষকের—দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করিতে থাকে।

যুদ্ধ ও শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয়-সভা বিত্তশালী শ্রেণীগুলির নিকট অধিক ঋণ দাবি করিলে তাহারা বিভিন্ন উপায়ে ঋণ সংগ্রহে ও জমিদারী উচ্ছেদ কার্যে বাধা দান করিতে আরম্ভ করে।[১] রাষ্ট্রীয়-সভা বাধ্য হইয়া বিত্তশালীদের উপর অধিক পরিমাণে কর ধার্য করে। এই কর কেবল বিত্তশালীদের উপরেই ধার্য হইয়াছিল। সাধারণ স্তরের মানুষকে কেবল করভার হইতেই অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য তাহাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয়-সভা আইন প্রণয়ন করিয়া জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং প্রকৃত চাষীদের হস্তে জমি দান করিয়াছিল।[২] রাষ্ট্রীয়-সভা যে খাজনা হ্রাস করিবার জন্যেও সচেষ্ট হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা

১

মহাবিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়া উঠে। সাধারণ সিপাহিগণ ও জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রামাঞ্চলের জমিদারদের হস্ত হইতে জমি কাড়িয়া লয়, শহরের বিত্তশালীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং সরকারী দলিল-পত্র ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলিল অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অন্যদিকে এই উৎসাহ ও গণতান্ত্রিক চেতনা দেখিয়াই বিদ্রোহে যোগদানকারী জমিদার, তালুকদার, সাহুকার প্রভৃতি বিত্তশালী শ্রেণীগুলি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের এই সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াই বিহারের ভূস্বামী, বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কুমার সিংহ বিদ্রোহী কৃষকদিগকে জমি দখলের কার্য হইতে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন :

> "দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত, জমির উপর জনসাধারণের (কৃষকের) অধিকার প্রমাণিত হইবে...।"[৩]

সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণ সাফল্যের উৎসাহে সকল অত্যাচারী বেনিয়া, বিত্তশালীদের গৃহ, দোকান প্রভৃতি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া ফেলিতে থাকে। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

১। Talmiz Khaldun : Great Rebellion (A Symposium).

২। Bundle 153. Fol. No. 16 (Persian). dtd. nil.

৩। রজনীকান্ত গুপ্ত : সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃ. ১৯২।

"যাহাদের হারাইবার মত কিছুই নাই, যাহারা শাসিত ও শোষিত তাহারাই বিদ্রোহী—দেশীয় শাসকগণ নহে।"[১]

সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের এই সকল ক্রিয়াকলাপের ফলে বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির নিকট বিদ্রোহের পরাজয় অপেক্ষা জয়ই অধিক ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির এই মনোভাব দেখিয়াই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ সেনাপতি আউটরাম লিখিয়াছেন :

"অযোধ্যা প্রদেশে একটি প্রকাণ্ড বিত্তশালী শ্রেণী, সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী জমিদাব ও প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রকৃতই আমাদের শাসন কামনা করে।"[২]

ইংরেজ সৃষ্ট নূতন জমিদার-গোষ্ঠীর ইংরেজ বিরোধী হইবার কোন কারণ ছিল না। তাহারা বিদ্রোহের প্রথম হইতেই ইংরেজ পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজ শাসনকে বাঁচাইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন জমিদার-গোষ্ঠীকে ইংরেজ-বিরোধী মনে করিয়া বিদ্রোহী কৃষক তাহাদের সহিত আপস স্থাপন করিলেও এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহের নেতৃত্বে বরণ করিলেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাহাদিগকে কখনই শত্রু বলিয়া গণ্য করে নাই। অযোধ্যা প্রদেশ এবং পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা সম্বন্ধে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাসক গুবিন্‌স্ লিখিয়াছেন :

"এই সংকটকালে পুরাতন ভূস্বামীদের আচরণ যথেষ্ট উদারতার সহিত বিচাব করিতে হইবে। কারণ শত্রুগণ (সিপাহী ও কৃষকগণ—সু বা) সশস্ত্র ও সংগঠিত হইয়া আকস্মিকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাইয়াছে। তাহাদের বাধা দানেব ক্ষমতা ভূস্বামী-গোষ্ঠীব ছিল না। আমাদের প্রতি যাহাবা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল তাহাদের প্রতি শত্রুবা অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। তাহাদের সম্পত্তি ও জীবন কিছুই নিরাপদ ছিল না।. সুতবাং তাহাদেব অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া আমাদের ত্যাগ কবিয়াছিল।"[৩]

গুবিন্‌সের মতে, ইংরেজ শাসনের শত্রু জমিদারগণ নহে, কৃষক-সম্প্রদায়। শাসক-গোষ্ঠীর এই ধারণা সত্য প্রমাণিত করিয়া জমিদারশ্রেণী তাহাদের সহজাত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য হিসাবেই এই গণবিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। শাসকগণ নির্ভুলভাবেই জনসাধারণকে—কৃষক-সম্প্রদায়কে—'শত্রু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। জমিদারশ্রেণী সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থবশত এবং ইংরেজ শাসনের এই শত্রুদের অর্থাৎ জনসাধারণ বা কৃষক-সম্প্রদায়ের ভয়েই শেষ পর্যন্ত জনগণের এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া বৈদেশিক শাসকগণের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির অনেকেই "নামে মাত্র বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। অনেকে আবার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সিপাহীদের গতিবিধি এবং তাহাদের গোলাবারুদের

১। Syed Ahmed Khan . The Causes of Indian Revolt. p.5

২। General Sir James Outram . Orders. Despatches & Correspondence 1859. p. 297

৩। M. R. Gubbins · An Account of the Mutinies in Oudh eyc. p. 58

অভাবের সংবাদ পাঠাইয়া সাহায্য করিত।"[১]

২

"বহু বেনিয়া ও তালুকদার ইংরেজ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিয়াছিল।"[২]

"কতিপয় ক্ষমতাশালী দেশীয় রাজার একমাত্র কার্য ছিল শৃঙ্খলা রক্ষা করা। যখন পূর্ণোদ্যমে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তখন তাঁহারা হয় আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, নতুবা নিরপেক্ষ হইয়া রহিয়াছিলেন।"[৩]

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তালুকদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত জানাইয়া লর্ড ক্যানিংয়ের ঘোষণা বাহির হইবার পূর্ব পর্যন্ত কোন তালুকদারের বিদ্রোহে যোগদানের কোন প্রমাণ ইংরেজ সেনাপতি আউটরাম খুঁজিয়া পান নাই। ক্যানিংয়ের ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পরেই তালুকদারগণ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল।[৪] সেনাপতি আউটরামের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং তাঁহার উক্ত ঘোষণা বাতিল করিবার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত প্রভু ও তালুকদারগণ ইংরেজ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।[৫] বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজ সরকার তালুকদারদের হস্তে পূর্বাপেক্ষাও অধিক জমি অর্পণ করিয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যা প্রদেশে সমস্ত কৃষিভূমির দুই-তৃতীয়াংশ বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়।[৬]

৩

যে সকল প্রদেশের গণবিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ যতদিন সম্ভব ইংরেজ সরকারকেই বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যে করিয়াছিল। তাহা যখন অসম্ভব হইত, কেবল তখনই তাহারা নিজেদের বিদ্রোহী পক্ষ-ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিত।[৭] তাহারা আশঙ্কা করিত যে, বিদ্রোহ জয়লাভ করিলে পূর্বের গ্রামীণ অর্থনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই অর্থনীতিতে তাহাদের কোন লাভের সম্ভাবনা থাকিবেন না; সুতরাং যে ইংরেজ শাসন তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ইংরেজ শাসনকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল।

ভারতীয় পার্শী-সম্প্রদায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকেই বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। কারণ, "তাহাদের ধন-সম্পদ হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য

১। Gubbins : Ibid. p. 73.
২। Lt General M Innes The Sepoy Revolt. Vol. III. p. 269.
৩। John Kaye A History of Sepoy War in India.. Vol. II. p. 260.
৪। T R Holmes : A History of the Indian Rebellion: p. 6.
৫। T. R Holmes : Ibid. p. 533.
৬। L. Strachey : India—Its Administration & Progress. p. 382
৭। Holmes : Ibid. Pages 45. 163. 170. 252. 261.

হয় নাই, তাহারা যে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করে তাহার কারণ এই যে, তাহারা অন্যান্য জাতির শাসনকালে যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, সেই উৎপীড়ন হইতে একমাত্র ইংরেজ শাসনই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং করিতেছে।...আমাদের অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য এই পার্শী ব্যবসায়িগণই সরবরাহ করিয়াছিল ''[১]

৪

মহাবিদ্রোহে ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও দেশীয় সরকারী কর্মচারীগণের ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত।[২] ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করিত যে, ভারতীয় হইলেও তাহারা অন্যান্য ভারতবাসী হইতে পৃথক এবং তাহারা ইংরেজ-পক্ষভুক্ত। সুতরাং এই সমগ্র সম্প্রদায়টি সংকটকালে ইংরেজ শাসকগণকে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করে নাই। এই জন্য নর্টন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট অকুণ্ঠভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

বিদ্রোহের সময় ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়টির এই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকাটি ইংরেজ শাকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ড সভায় আর্ল গ্র্যানভিল বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন :

> "শিক্ষিত (ইংরেজী-শিক্ষিত—লেঃ) ভারতীয়গণ সিপাহী-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই..বরং তাহারা উৎসাহের সহিত এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করিয়াছে এবং সেই সংকটকালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে।"[৪]

৫

তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন সম্পত্তিশালী শ্রেণী ও ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়টি যখন সিপাহী-কৃষক-কৃষিশ্রমিক-কারিগর জনতার মহাবিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত হইতে বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের ও জমিদার-গোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, তখন ভারতের সম্মিলিত গণশক্তিই কেবল নেতৃত্বহীন হইয়াও বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে সংগ্রাম চালাইতেছিল।

বিহারের বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষক বিদ্রোহীদের দ্বারা য়ুরোপীয়দের সম্পত্তির ধ্বংস সাধন। নীলকর সাহেবগণ তাহাদের সকল অর্থ ব্যয় করিয়া নীলের

১। Thomas Lowe : Ibid. p. 339.

২। Holmes : Ibid. p. 143.

৩। L. Norton : Topics for Indian Statesman. p 56

৪। Earl Granville. Feb. 19. 1858. in reply to the charges of the President of the Board of Control. Parliamentary Debates. 3rd Series. CXL VIII. 1858. p. 1728-29

চাষ করিয়াছিল। সেই নীলগাছ কাটিবার সময়েই তাহা ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের পলায়ন করিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা সমস্ত নীলগাছ ধ্বংস করিয়া ফেলে। নীলকরদের কুঠিগুলি ছিল ইংরেজ নীলকর সাহেবদের কৃষক-শোষণের কেন্দ্র। বিদ্রোহী কৃষক বিহারের সকল নীলকুঠি ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।[১]

> "যে সময় অন্য সকল শ্রেণী বৃটিশ শক্তিকেই রক্ষক মনে করিয়া উহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল, তখন কেবল ভারতের কৃষকই বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল। এইভাবে, প্রথমে ইংরেজ শাসনের পূর্ববর্তী জরাজীর্ণ অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইলেও, এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের জমিদারি-প্রথা ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষকের যুদ্ধ হিসাবেই সমাপ্ত হইয়াছে।"[২]

মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রধান ঘটনা। উত্তর-ভারতের চারিটি বিশাল প্রদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের এই মিলিত অভ্যুত্থান মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে পরাজিত হইল কেন?

এই অভ্যুত্থানের *ব্যর্থতার* বহু কারণের মধ্যে *প্রধান কারণ দুইটি* : ***প্রথমত,*** সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের সংগঠন ও প্রস্তুতির একান্ত অভাব এবং রাজ্যহারা সামন্ত রাজগণ ও জমিদারী-হারা ভূস্বামী তালুকদার-গোষ্ঠীর নেতৃত্বের উপর বিদ্রোহী সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা; ***দ্বিতীয়ত,*** সামন্ত রাজগণ, ভূস্বামী-তালুকদার প্রভৃতি বিত্তশালী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা।

রাজ্যহারা রাজা ও রানী এবং জমিদার-হারা ভূস্বামী-তালুকদারগোষ্ঠী নিজ নিজ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার শেষ চেষ্টা হিসাবেই এই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বৈদেশিক ইংরেজ শাসনকে বিতাড়িত করিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ হইতে জনসাধারণের মুক্তি সাধনের কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ক্যানিং ভূস্বামীগণের সম্পত্তির উপর অধিকার *"চিরকালের জন্য"* স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা অভ্যুত্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজ শাসকদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে যে চরম বিভ্রান্তি ও হতাশা দেখা দেয়, তাহাই এত অল্প কালের মধ্যে বিদ্রোহের চূড়ান্ত পরাজয়ের প্রধান কারণ। ভারতীয় সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই অভ্যুত্থানের প্রাণপণ বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসকগণের সহিত অকুণ্ঠ সহযোগিতা

১। Sashi Bhuson Roy Choudhury : Civil Rebellion in the Indian Mutinies, p. 173-74.

২। Talmiz Khaldun : The Great Rebellion.

অভ্যুত্থানের পরাজয় ত্বরান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণগুলি নিম্নরূপ :

(১) সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব : সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবই বিদ্রোহের ব্যর্থতার মূল কারণ। বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্বে করিবার জন্য একটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল বৈপ্লবিক শ্রেণী অপরিহার্য। যে শোষিত শ্রেণী পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও উহার প্রয়োজনানুরূপ শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য শ্রেণীকে সংহত ও সংগঠিত করিয়া তুলিতে এবং নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করিতে পারে—এরূপ শ্রেণী তৎকালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইংরেজ বণিক শাসকগণ ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়াছিল এবং পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের সহিত আপস করিয়া উহার সহায়তায় আপন শাসন ও শোষণের কার্য চালাইতেছিল। সেই সময় পর্যন্ত সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে নূতন সমাজের অগ্রদূতরূপে 'বুর্জোয়া' বা শ্রমিক-শ্রেণী আবির্ভূত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণ ছিল সচেতন বৈপ্লবিক নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত।

মহাবিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল কৃষক-সম্প্রদায়। কিন্তু কৃষক-সম্প্রদায় কোন শ্রেণী নহে, এই সম্প্রদায়টি কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবর্তী কৃষক, ধনী-কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। ইহারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ ও নির্যাতনে পিষ্ট হইলেও নূতন কোন সমাজের ধারণা, এমন কি কোন আদর্শ ইহাদের থাকে না। তাই এই সম্প্রদায়টি সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী নূতন সমাজ-বিপ্লবের নায়ক ধনিকশ্রেণী অথবা শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা সংহত ও চালিত হইয়া থাকে। মহাবিদ্রোহের সময় এই প্রকার কোন উন্নত শ্রেণী না থাকায় এই সম্প্রদায়টিকে উহার মুক্তির জন্য রাজা ও রানী, ভূস্বামিগোষ্ঠী প্রভৃতি ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব কোন সংগঠন, অথবা কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির হস্তে ছিল না, উহার নেতৃত্ব ছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় লইয়া গঠিত এক বিশাল জনতার হস্তে। এই জনতার মধ্যে ছিল সম্পত্তিহারা ভূস্বামিগণ, ছিন্নমূল কারিগরগণ, বুভুক্ষু কৃষকগণ, বিক্ষুব্ধ সিপাহিগণ এবং ধর্মোন্মাদ পুরোহিত ও মোল্লাগণ। ইহাদের মধ্যে স্বাধীন ভারতের ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করিত এবং সেই ধারণা অনুযায়ী তাহারা নিজ নিজ কর্মপন্থা অনুসরণ করিত। অভ্যুত্থানের আদর্শগত ঐক্যের অভাব তাহাদের মধ্যে চরম আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল বিরোধের বীজ; অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের পর দিল্লী নগরীতে যে রাষ্ট্রীয় সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার ধারণাই প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধারণা অনুযায়ী যে শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল তাহা ছিল জরাজীর্ণ গ্রাম-পঞ্চায়েতেরই প্রতিরূপ।

জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এই প্রকার সামন্ততান্ত্রিক, অসংগঠিত ও আদর্শহীন নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ সহস্রগুণ শক্তিশালী বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রচণ্ড আঘাতে মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(২) জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা : নেতৃত্বের গণচেতনার অভাব ও জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। রাজ্যহারা সামন্ত নৃপতি ও ভূস্বামিগণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব হস্তগত করিয়া কৃষক জনসাধারণকে বিদ্রোহ হইতে দূরে রাখিবার জন্যই সচেষ্ট হইয়াছিল। যে কৃষক-শোষণের অবাধ অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, সেই কৃষকগণের যোগদানের ফলে বিদ্রোহে জয়লাভ করিলে তাহাদের রাজ্য ও ভূসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ইহা সামন্ত নৃপতি ও ভূস্বামী নায়কগণ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং তাহারা কেবল ব্যারাকবাসী সিপাহীদের মধ্যেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। এই সম্বন্ধে শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তের সিদ্ধান্তটি উল্লেখযোগ্য :

> "বৃটিশের আন্তর্জাতিক প্রভূত্ব ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিরোধ করা বিদ্রোহীদের সাধ্যাতীত ছিল। ইহার সহিত বুঝাপড়া করা আরও শক্তিশালী ও ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই কেবল সম্ভব হইত। কিন্তু যাহাতে নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসীরাও এই প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ কার্যে অগ্রসর হইতে বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব সাহসী হয় নাই।"[১]

(৩) যোগ্য সেনানায়কের অভাব : মহাবিদ্রোহে ভারতীয় সিপাহিগণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যুত্থানের প্রথমভাগে সিপাহী-বাহিনী বহু খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও এই সকল যুদ্ধের মধ্য হইতে কোন যোগ্য সেনানায়কের আবির্ভাব ঘটে নাই। ভারতীয় সিপাহিগণ যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল এবং বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া অকাতরে প্রাণবিসর্জন দিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, কতিপয় যোগ্য সেনানায়কের আবির্ভাব ঘটিলে, অন্তত সামরিক দিক হইতে, অভ্যুত্থানের পরিণাম অন্যরূপ হইত। পাঞ্জাবের সমসাময়িক কালের প্রাদেশিক শাসক ও সেনানায়ক স্যার জন লরেন্স ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন :

> "সিপাহীদের মধ্যে যদি একজনও প্রতিভাবান সেনানায়ক থাকিত, তবে আমাদের সর্বনাশ হইত।"[২]

(৪) সেনা-নায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতা : মোগল সম্রাটের কতিপয় উচ্চবংশোদ্ভূত কর্মচারী ও সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতা সামরিক পরাজয়ের অপর একটি কারণ বলিয়া গণ্য হয়। ইহারা যে ইংরেজ সেনাপতিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহী

১। Amalendu Dasgupta : Our First National War–article (War of Independence. Centenary Souvenir.)

২। Quoted from Talmiz Khaldun . Ibid

সিপাহীদের উপর আক্রমণ ও তাহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বহু তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন।

মোগল সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্মচারী হাকিম আশানুল্লাকে ইংরেজ সেনাপতিদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা হইত। কুলি খাঁ নামক গোলন্দাজ-বাহিনীর একজন অধিনায়কের অধীনস্থ কামানশ্রেণী হইতে একদল যুদ্ধ-প্রত্যাগত সিপাহীদের উপর গোলাবর্ষণ করা হইয়াছিল। ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।[১] ইংরেজ জেনারেল হুইলার প্রভৃতি ইংরেজ সেনাপতি বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে বহু গুপ্তচর প্রবেশ করাইতে এবং তাহাদের মারফত বিদ্রোহী বাহিনীর সেনানায়কদের, বিশেষত গোলন্দাজ-বাহিনীর পরিচালকদের গোপনে ইংরেজ-পক্ষভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।[২] নুনে নবাব, ওরফে মহম্মদ আলি খাঁ ছিলেন এই প্রকারের একজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি। ইংরেজ সেনাপতি হুইলার তাঁহার গুপ্তচরের নিকট এই বলিয়া বিদ্রোহী-পক্ষের এই গোলন্দাজ সেনাপতি নুনে নবাবের পরিচয় দিয়াছিলেন :

> "সে (নুনে নবাব) আমাদের বিশেষ অনুগত। আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। তাহাকে বলিবে, সে যেন বিদ্রোহীদের ঐক্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। বিদ্রোহীরা যদি আমাদের জ্বালাতন না করে, অথবা তাহারা যদি তাহাদের ঘাঁটি ত্যাগ কবিয়া চলিয়া যায়, তবে আমি তাহাকে (নবাবকে) যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"[৩]

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হুইলার এই নুনে নবাবের উপর যথেষ্ট ভরসা করিতেন। বিদ্রোহী-বাহিনীতে এই প্রকারের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। ইহারা প্রয়োজন হইলেই বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজ পক্ষকে সাহায্য করিত এবং বিদ্রোহী সিপাহিগণ তাহাদের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবামাত্র ইহারা পলায়ন করিয়া ইংরেজ পক্ষে যোগদান করিত। বিদ্রোহী সিপাহিগণও সন্দেহ হইবামাত্র এই প্রকার সেনানায়ককে গ্রেপ্তার করিত। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের প্রায় সকলেই ছিল উচ্চবংশোদ্ভূত এবং নিষ্ক্রিয় মোগল বাহিনী হইতে বিদ্রোহী বাহিনীতে নিযুক্ত।

(৫) বৃটিশ সামরিক শক্তির বৃদ্ধি : বিদ্রোহ আরম্ভের পূর্বে ভারতবর্ষে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প। কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভের সময় ক্রিমিয়া ও পারস্যের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় এই উভয় স্থান হইতেই বহু সহস্র ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরেজদের সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এই সময় আফগানিস্থানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াও শাসকগণ পশ্চিম-ভারত হইতে বহু সহস্র সৈন্য বিদ্রোহের অঞ্চলে প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহ আরম্ভের সময় বহু সহস্র ইংরেজ সৈন্য

১। Surendra Nath Sen : Eighteen Fifty-senen, p. 86-87.

২। Surendra Nath Sen : Ibid, 143.

৩। Ibid : page 143.

চীনের পথে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিপুল ইংরেজ বাহিনীকেও ভারতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়া বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে বিদ্রোহের সময় ভারতে সুশিক্ষিত ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে, প্রায় নিরস্ত্র ও শৃংখলাহীন ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণবিসর্জনের ফলে ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে।

(৬) বিদ্রোহী বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের অভাব : ইংরেজ বাহিনীর উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের কোন অভাব ছিল না। বিদ্রোহের প্রথমভাবে বিদ্রোহী পক্ষে কামানের সংখ্যা অধিক থাকিলেও দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প এবং গোলন্দাজ-বাহিনীর সেনাপতিগণ প্রায় সকলেই ছিল অপদার্থ। অধিকন্তু, অধিকাংশ গোলন্দাজ সেনাপতিই ছিল বিশ্বাসঘাতক। ইংরেজ সেনাপতিগণ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া কামানের অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যে 'এণ্ডফিল্ড রাইফেল' মহাবিদ্রোহের আপাত কারণ বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ছিল তৎকালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাইফেল এবং ইহাদ্বারা সকল ইংরেজ সৈন্য সজ্জিত ছিল। ইহার টোটা গরু-শূকরের চর্বি মাখানো থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা বহু চেষ্টায় অল্প সংখ্যক মাত্র 'এনফিল্ড রাইফেল' হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই 'এনফিল্ড রাইফেলের' সহিত বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল পুরাতন ধরনের 'মাস্কেট' বন্দুক, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি দ্বারা। বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ ছিল তাহা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল অযোধ্যা প্রদেশে।

> "অযোধ্যা প্রদেশের বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল মাত্র ৬৮৪টি কামান, ১,৮৬,১৭৭টি 'মাস্কেট' বন্দুক, ৫,৬১,৩২১ খানি তরবারি, ৫০,২১১টি বর্শা এবং ৬,৩৮,৬৪৩টি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র। ইংরেজ সৈন্যদের শরীরে অধিকাংশই ছিল তরবারির আঘাত।[১]

(৭) জনযুদ্ধের কৌশলের প্রতি অবহেলা : গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া কেবলমাত্র সম্মুখ-যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করা বিদ্রোহের সামরিক পরাজয়ের অন্যতম কারণ। আকস্মিক আক্রমণের ফলে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনী প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিলেও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত, সুশৃংখল ও সংখ্যাধিক ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে বিদ্রোহীদের শেষ পর্যন্ত জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। অথচ সিপাহিগণ ও তাহাদের সেনাপতিগণ বহুগুণ শক্তিশালী ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধকেই একমাত্র যুদ্ধ-কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং কেবলমাত্র শহরাঞ্চলেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখিয়া বিদ্রোহের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

Talmiz Khaldun : Ibid.

এই মহাবিদ্রোহের মূল ও প্রধান শক্তি ছিল কৃষক জনসাধারণ। বিদ্রোহের প্রথম হইতেই, এমন কি কোন কোন অঞ্চলে সিপাহীদের অভ্যুত্থানের পূর্বেই, জনসাধারণ সিপাহীদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং বহুভাবে বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে সহায়তা দান করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সিপাহীদের নেতৃবৃন্দ কৃষক জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়া এবং কৃষকের গেরিলা যুদ্ধের মারফত বিশাল গ্রামাঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তৃত করিয়া ইংরেজ বাহিনীকে সর্বত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহা বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের এই অদূরদর্শিতার পরিচয় পাঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশেও পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের কৃষক জনসাধারণ বিদ্রোহ আরম্ভের পর রেলপথ তুলিয়া ফেলিয়া এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেও[১] পাঞ্জাবের বিজয়ী সিপাহিগণ কৃষক জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আরও সক্রিয় করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। বঙ্গদেশ হইতে বিদ্রোহের আরম্ভ হইলেও অভ্যুত্থানের পূর্বে বঙ্গদেশের চিরবিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন ও তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের সংগঠন প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

(৮) গণদাবির প্রতি অবহেলা : অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের পর দিল্লীর রাষ্ট্রীয়-সভা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষকের হস্তে জমি সমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেও সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হইলে হয়ত সম্পত্তিহারা রাজা ও জমিদারগণ অভ্যুত্থানে যোগদান না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত, কিন্তু সমগ্র উত্তর-ভারতের কৃষক জনসাধারণ তাহাদের নবলব্ধ জমির অধিকার রক্ষার জন্য নিজ হইতেই ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিত। সিপাহীদের সহায়তায় কৃষক জনসাধারণের সেই সশস্ত্র সংগ্রাম সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া গেরিলা-যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করিত এবং ইংরেজ বাহিনীগুলি বিশাল উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত বলিয়া তাহাদের পরাজিত করা সহজ হইত। উনবিংশ শতাব্দীরই প্রারম্ভকালে মহাবীর নেপোলিয়নের বিশাল সৈন্যবাহিনী স্পেনদেশের কৃষকের গেরিলা-যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই শিক্ষা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ প্রথম হইতে কৃষক জনসাধারণের জমির দাবি পূরণ করিলে এবং তাহাদের সংগঠিত করিয়া গেরিলা-যুদ্ধের আয়োজন করিলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পরিণতিও অন্যরূপ হইত।

(৯) ইংরেজ পক্ষে টেলিগ্রাফের সুবিধা : উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আর একটি শক্তিশালী অস্ত্র ইংরেজ শাসকগণের করায়ত্ত ছিল। এই অস্ত্রটিও মহাবিদ্রোহে ইংরেজ

১। Kaye & Malleson : History of the Indian Mutiny. Vol. IV. p. 314. & Punjab Mutiny Records. Vol III. p. 196.

শক্তির জয়লাভের অন্যতম কারণ বলা যায়। এই অস্ত্রটি হইল তৎকালে নব-প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা। এই টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বিশাল উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ইংরেজ বাহিনীগুলির মধ্যে সকল সময় সংযোগ রক্ষা করা এবং দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অসাধারণ। বিদ্রোহীরা সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা হইতেই বঞ্চিত ছিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষ অসীম গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। শাসকগণও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

> "বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষে ইহা সম্প্রতি (বিদ্রোহকালে—লেঃ) যে গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা আর কখনও ইহা গ্রহণ করে নাই। ভারতে এই টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা না থাকিলে এই বিদ্রোহের প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন ক্ষমতা অর্ধেক হ্রাস পাইত। ইহা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষাও অধিক কার্যকর হইয়াছে।"[১]

মহাবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ও অবদান

১

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বিভিন্ন কারণে সমগ্র পরাধীন ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। কারণসমূহ নিম্নরূপ :

প্রথমত, উত্তর-ভারতের প্রায় সকল অংশে সকল শ্রেণীর সকল ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ তাহাদের শ্রেণীগত ও ধর্মীয় বিরোধ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যবদ্ধভাবে একসারিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর গূঢ় উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রকাশ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এক—সাধারণ শত্রু ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন। এই বিদ্রোহে আধুনিক কালের ন্যায় জাতীয়তাবাদ স্পষ্টরূপে দেখা না গেলেও ইহাই যে পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ যে ঐক্যবদ্ধভাবে একজন মুসলমান বাদশাহ্‌কে স্বাধীন ভারতের প্রধানের পদে বরণ করিতে পারিয়াছিল, ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। মহাবিদ্রোহের আন্তর্জাতিক গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নহে। কার্ল মার্কস্ মহাবিদ্রোহের এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন :

> 'ইহার পূর্বেও ভারতীয় সৈনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু এই বিদ্রোহ কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। এই বিদ্রোহেই সর্বপ্রথম সিপাহিগণ তাহাদের য়ুরোপীয় অফিসারদের হত্যা করিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ ভুলিয়া তাহাদের সাধারণ প্রভুর বিরুদ্ধে

১। Sir W. H. Russel : My Diary in India in the Year 1858-59. Vol. II p. 259.

মিলিত হইয়াছিল, এবং হিন্দুদের দ্বারাই প্রথম বিদ্রোহর সূচনা হইলেও শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সম্রাটকে বসাইয়া সেই বিদ্রোহকে পূর্ণতা দান করা হইয়াছিল।" "বিদ্রোহ মাত্র কতিপয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এবং সর্বশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর এই বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মহান এশিয়াটিক জাতিগুলির সাধারণ বিরূপ মনোভাবের মিলন ঘটিয়াছিল, কারণ বঙ্গীয় বাহিনীর বিদ্রোহ নিঃসংশয়েই পারসিক ও চীনের যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।"[১]

দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণবিদ্রোহ যাহা প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী ইংরেজ শাসনের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল।

তৃতীয়ত, ইহাই প্রথম ও একমাত্র গণবিদ্রোহ যাহাতে জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী একত্রে সাধারণ শত্রুর উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছিল।

চতুর্থত, ভারতের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিদ্রোহ যাহা বণিকশাসনরূপ ইতিহাসের "নিকৃষ্টতম শাসনব্যবস্থার" অবসান ঘটাইয়া প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পঞ্চমত, এই মহাবিদ্রোহ ভারতের সামন্ততন্ত্র ও উহা হইতে উদ্ভূত মধ্যশ্রেণী এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরম প্রতিক্রিয়াশীল গণ-সংগ্রাম ও জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র স্পষ্টতমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া পরবর্তীকালের গণ-সংগ্রামে ইহাদের ভূমিকার প্রতি উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করিয়াছে।

এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ না করিলেও, এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের সংগ্রামী কৃষক-সম্প্রদায়কে ইহাতে যোগদানের আহ্বান না জানাইলেও, এই জাতীয় মহাবিদ্রোহ উদ্দেশ্যের ঐক্য, সংগ্রাম-কৌশল, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মদানের যে জ্বলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের সংগ্রামী জনসাধারণের পক্ষে অমূল্য সম্পদস্বরূপ।

দুই বৎসরের সংগ্রামের পর প্রধানত উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এবং উচ্চশ্রেণীসমূহের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যর্থতাই এই বিদ্রোহের প্রধান শিক্ষা নহে। ইহার প্রধান শিক্ষা এই যে, জনসাধারণ সুদৃঢ় ঐক্যের দ্বারা, নির্ভুল সংগঠন ও উপযুক্ত প্রস্তুতি দ্বারা, লেনিনের কথায়, "স্বর্গও বিধ্বস্ত করিতে পারে"[২] এবং সেই স্বর্গের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বর্গস্বরূপ ভারতের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এই স্বর্গের উপর, সামরিকভাবে হইলেও, আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১। Karl Marx · Article (Published in the New York Daily Tribune, 15th July, 1857).

২। V. I. Lenin : Paris Commune.

২

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ কিনা সেই সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ ও বিতর্কের অন্ত নাই। এই বিদ্রোহের স্থানীয় সীমাবদ্ধতা এবং ইহাতে কতিপয় রাজ্যহারা সামন্তরাজের যোগদান ও স্বাধীন ভারতের প্রধানরূপে দিল্লীর বাদশাহের নাম ব্যবহারের ফলে পণ্ডিতগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাহা হইতেই এই মতভেদ ও বিতর্কের সৃষ্টি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ কাহারও মতে স্বাধীনতার যুদ্ধ, আবার কাহারও মতে সামন্ত প্রভুদের প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রাম। যে সংগ্রাম বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও সমগ্র দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং জনসাধারণের অংশ গ্রহণে পরিচালিত হয় তাহাকে কেবলমাত্র কতিপয় রাজ্যহারা সামন্ত প্রভুর "জনসাধারণের হস্তে বন্দীরূপে"[১] যোগদানের জন্যই,' "প্রতিক্রিয়াশীল" আখ্যা দান করা হাস্যকর; যে সংগ্রামের মুলশক্তি ছিল চারিটি বিশাল প্রদেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ, বিশেষত শতাব্দীকাল-ব্যাপী শোষণ-উৎপীড়ন জর্জরিত, ভূমি ও গৃহহীন কৃষক জনসাধারণ, সেই সংগ্রামকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কেবল অজ্ঞতা-প্রসূত নহে, উদ্দেশ্যমূলক।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষত বিদেশী ইংরেজ শাসকদের পদলেহী রাজন্যবর্গ দ্বারা শাসিত এবং ইংরেজ-সৃষ্ট মধ্যশ্রেণী-প্রধান অঞ্চলের জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা, উচ্চশ্রেণী সমূহের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কারণে এই মহাবিদ্রোহ সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ না করিলেও, চারিটি প্রদেশের জনসাধারণ সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল; তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। সুতরাং এই সংগ্রামে সমগ্র ভারতবর্ষ যোগদান না করিলেও, ইহা উক্ত চারিটি প্রদেশের জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত সমগ্র ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা সংগ্রাম। সংগ্রামী গণশক্তির হস্তে বন্দী দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ্‌কে এই সংগ্রামে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল মাত্র।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের **সহিত** ১৯২১ ও ১৯৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহত্তম দুইটি সংগ্রামের তুলনা করিলে মহাবিদ্রোহের গণচরিত্র, ব্যাপকতা, গভীরতা, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ এবং বিদ্রোহীদের আপসহীন মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

প্রথমত, গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস-পরিচালিত উক্ত দুইটি ভারতব্যাপী সংগ্রাম শেষ হইয়াছিল বৈদেশিক শাসনের নিকট আত্মসমর্পণে। আর মহাবিদ্রোহে জনসাধারণ অকাতরে জীবন বলি দিয়া আপসহীন সংগ্রামের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বিদ্রোহী সিপাহিগণ ও জনসাধারণ আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবলিদানকে শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়াছিল।

১। নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপি, এমনকি মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহও নিজেদের "জনসাধারণের হস্তে বন্দী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস-পরিচালিত উক্ত দুইটি সংগ্রামে ভারতবর্ষের শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষকে অর্থাৎ কৃষক জনসাধারণকে দূরে রাখিয়া কেবল সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং (চৌরিচৌরা প্রভৃতি কতিপয় অঞ্চলের) কৃষক-সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং জমিদারশ্রেণীর খাজনা বন্ধ প্রভৃতির দ্বারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবামাত্র উভয় সংগ্রামই তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। অন্য দিকে, উত্তর-ভারতের চারিটি প্রদেশের সংখ্যাধিক কৃষক জনসাধারণের অংশগ্রহণই ছিল মহাবিদ্রোহের সংগ্রাম-শক্তির উৎস।

তৃতীয়ত, এমনকি ১৯৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহত্তম সংগ্রামেও আইন-অমান্য দ্বারা কারাবরণই একমাত্র সংগ্রাম-পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক লক্ষ "অসহযোগী" স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছিল। আর মহাবিদ্রোহের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিল চারিটি প্রদেশের কোটি কোটি কৃষক, এবং লক্ষাধিক সিপাহী ও কৃষক প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রটার হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথম বারো মাসের সংগ্রামে ত্রিশ সহস্র সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, এবং প্রায় দশ সহস্র সশস্ত্র বিদ্রোহী (প্রধানত কৃষক—লেঃ) বৃটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। "দুই বৎসরে (১৮৫৭-৫৮) অস্ত্রাঘাত, দুঃখকষ্ট-পরিশ্রম ও বিচারালয়ের প্রাণদণ্ড প্রভৃতির ফলে লক্ষাধিক সিপাহী প্রাণ হারাইয়াছিল। এই দুই বৎসরে অন্য যে সকল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে নিঃসন্দেহে নিহতের সংখ্যা আরও অধিক।"[১]

যদি চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের কারাবরণ জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে মহাবিদ্রোহে কোটি কোটি মানুষের সর্বস্বপণ সংগ্রাম ও লক্ষাধিক ভারতবাসীর আত্মবলিদানকে জাতীয় সংগ্রাম বলিতে অস্বীকার করা কেবল আত্মপ্রতারণাই নহে, ইহা ভারতের জনসাধারণের প্রতি চরম অবমাননা এবং চরম জনবিরোধী মনোভাবেরই পরিচায়ক।

মহাবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রথমে বঙ্গদেশ হইতে দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রভাবে বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। বিদ্রোহের সাংগঠনিক দুর্বলতাই ইহার কারণ বলিয়া অনুমতি হয়। বিভিন্ন কারণে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, সাংগঠনিক চেতনার অভাবেই হউক, অথবা অবাঙ্গালী সিপাহীদের ভাষাগত অসুবিধার জন্যই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, সামরিক ব্যারাকবাসী সিপাহিগণ বাংলা দেশের কৃষকের সহিত,

১। L. Trotter : India Under Queen Victoria. Part II, p. 89.

অথবা অন্য কাহারও সহিত সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয় নাই। বঙ্গদেশে ইহা কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহ রূপেই দেখা দিয়াছিল, জনসাধারণের বিদ্রোহ রূপে নহে। তথাপি মহাবিদ্রোহ যে সমগ্র প্রদেশে ব্যাপক চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রামাণ পাওয়া যায়।

ব্যারাকপুরের সৈন্য-ব্যারাকে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির ঘটনা হইতেই মহাবিদ্রোহের আরম্ভ। ইহার পরেই বিদ্রোহ হয় বহরমপুরের সিপাহি-ব্যারাকে। কিন্তু গণ-সংযোগ ও গণ-সমর্থনহীন এই দুই ব্যারাক-বিদ্রোহ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়। চট্টগ্রামে অবস্থিত ক্ষুদ্র সিপাহিদল বিদ্রোহ করিয়া নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ঘুরিয়া আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পর কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

চট্টগ্রামে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং অন্যান্য অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক কালের লেখকগণের রচনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া যায় :

(১) "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩৪০০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক বাহিনীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বাহিনী সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অভিমুখে অভিযান করে। রাজার অধীনস্থ ক্ষুদ্র সৈন্যদলটি বিদ্রোহী সিপাহি-বাহিনীকে বাধা দিতে পারে নাই। পরে অবশ্য রাজা পার্বত্য ত্রিপুরার সীমানার মধ্যে ভ্রাম্যমান বিদ্রোহীদিগকে দেখিবামাত্র গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।"[১]

(২) "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহি-বিদ্রোহ ত্রিপুরাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে এই সংবাদে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, চট্টগ্রামে সিপাহীদের তিনটি কোম্পানী বিদ্রোহী হইয়া চট্টগ্রাম হইতে পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্রোহী সিপাহিগণ পলাতক কয়েদীদের ও পার্বত্য উপজাতীয়দের সহিত মিলিত হইয়া উদয়পুর[২] অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কুমিল্লাগামী[৩] প্রধান পথটি পুলিশ ও রাজার সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ দেখিয়া বিদ্রোহিগণ পুনরায় পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা অল্প কয়েক মাইল মাত্র সমতল ভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল।"[৪]

(৩) "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যগণ সাহায্য লাভের আসায় ত্রিপুরাপতির নিকট আসিতেছে—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া

১। W. W. Hunter : Statistical Account of the State of Hill Tipperag, p. 468.
২। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব রাজধানী।
৩। ত্রিপুরা জেলার সদর।
৪। Webster : Eastern Bengal District Gazetteers. Tipperah. Vol. 19th. p. 19.

মহারাজা ঈশানচন্দ্র[১] তাহাদিগকে ত্রিপুরা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বৃটিশ রাজ্য দিয়া কাছাড় অভিমুখে প্রস্থান করে। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলা পূর্বক আগরতলার নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কুমিল্লাস্থ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় তাহাদের ফাঁসী হইয়াছিল।"[২]

(৪) বর্ধমান বিভাগে কোন সংগঠিত বিদ্রোহ না হইলেও কোন কোন ব্যক্তি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বীরভূম জেলার রঞ্জন শেখ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৩] এই জেলার করিম খাঁ নামক জনৈক সর্দার প্রকাশ্যভাবেই "বিদ্রোহী মনোভাব দেখাইয়াছিলেন"—এই অভিযোগে তাঁহার ফাঁসী হয়' মেদিনীপুর জেলায় বৃন্দাবন তেওয়ারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যেই জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহারও ফাঁসী হয়। এই জেলার মীর জাঙ্গু ও শেখ জামিরুদ্দিন নামক দুইজন "বিদ্রোহীকে" দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৪]

(৫) প্রেসিডেন্সি বিভাগেও কোন সংগঠিত বিদ্রোহ দেখা না দিলেও কোন কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মালদহ জেলায় চমন সিং নামক এক ব্যক্তি "রাজদ্রোহের" অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সিপাহিগণ বিদ্রোহ করিলে একজন ক্ষুদ্র রাজার নেতৃত্বে দুইশত ভুটিয়ার একটি দল তিনটি বন্দুকসহ বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ঢাকার সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া ভুটানে প্রবেশ করিলে ভুটানের রাজা তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "হাতিয়া রাজা"[৫] বলিয়া কথিত হরক সিং নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী সিপাহীদের বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। হুগলী জেলায় কুবেরচন্দ্র চৌধুরী নামক জনৈক সরকারী জেল-ডাক্তার "রাজদ্রোহ মূলক" ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যশোহর জেলার পরাগ ধোবী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৬]

(৬) ফরিদপুর জেলার ফরাজীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এবং তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, ফরাজী নায়ক আবদুল সোভান ও রিয়াসৎ আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে "রাজদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপে"

১। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা।
২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ : রাজমালা, ১৭৭ পৃ.।
৩। S. B. Choudhury : Civil Rebellion in the Indian Mutinies. p. 202.
৪। S. B. Choudhury : Ibid, p. 202.
৫। ইনি দীর্ঘকাল ভূটানে হাতি ধরিতেন বলিয়া তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে।
৬। S. B. Choudhury : Ibid. p. 203.

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সতর্কামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিখ্যাত ফরাজী নায়ক দুদুমিঞাকে পুনরায় "রাজবন্দী" (State Prisoner) হিসাবে আলিপুর জেলখানায় আটক রাখা হইয়াছিল।[১] মধু মল্লিক নাম জনৈক বাঙালীকে "রাজদ্রোহের" অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।[২]

বঙ্গদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা

মহাবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণী যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কেবল মহাবিদ্রোহের সময়ই নহে, সেই ভূমিকাই কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকল সম্প্রদায় কর্তৃক পরবর্তীকালের সকল বৈপ্লবিক সংগ্রামেও একই ভাবে অনুসৃত হইয়াছে। মহাবিদ্রোহ-কালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

(১) জমিদারশ্রেণী : মহাবিদ্রোহের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত জমিদারশ্রেণী ইংরেজ শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখিয়াছিল। ইংরেজ শাসনের সহিত ইহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কই ইহাদিগকে বিদেশী ইংরেজ শাসন অব্যাহত রাখিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। কৃষক শোষণকারী, ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী মহাবিদ্রোহে কৃষকের, বিশেষত অযোধ্যা ও বিহারের কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ইংরেজ শাসনের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে যোগদান করিতে না পারিলেও তাহাদেরই অপর অংশ, বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, সর্বপ্রকারে মহাবিদ্রোহে যোগদান করিয়া নিজস্ব উপায়ে ইহাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত করিয়াছিল।

বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, কেবল ইংরেজ শাসনকেই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার, তালুকদার ও মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিণতিস্বরূপ মহাবিদ্রোহ কৃষি-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতেছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণীর পক্ষে ইহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হইলে উহাদ্বারা সৃষ্ট জমিদারী-তালুকদারী প্রথাও বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং তাহারা তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল একত্র করিয়া ইংরেজ শাসকগণের সহিত সহযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজ ছিলেন বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর মুখপাত্র এবং নেতৃস্থানীয়। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ মহাবিদ্রোহে বঙ্গীয় জমিদার-গোষ্ঠীরই মনোভাবের পরিচায়ক।

> "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজ তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সরকারকে বহু হস্তী ও গো-যান সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং বর্ধমান হইতে কাটোয়া এবং বর্ধমান হইতে বীরভূম পর্যন্ত সমস্ত রাজপথ আমাদের জন্য নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে রাজধানীর

১। Ibid, p. 203

২। Surendra Nath Sen : Eighteen Fifty-seven, p. 408.

(কলিকাতার) সহিত বহরমপুর, বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলগুলির যোগাযোগ এবং এই সকল স্থানের সংবাদ পাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই।"[১]

মহাবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশের জমিদার-গোষ্ঠীর ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য ও এই বিপদের সময় জমিদার-গোষ্ঠীর সাহায্যদান সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক সমসাময়িক কালের একখানি সাময়িক পত্রে লিখিত হইয়াছিল :

"সরকার জমিদারদের নিকট আবেদন করিলেন এবং জমিদারগণ রাজভক্ত প্রজার মত সরকারকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। জমিদারগণ গাড়ী ও গরুর মালিকদের অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাহাদের পরিবার রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। জমিদারগণই তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ দিলেন এবং তাহারা এরূপ আরও বহু প্রকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন যাহা একমাত্র জমিদারগণই দিতে পারেন। ইহার ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রাণীগঞ্জে ৭,০০০ গাড়ী জমায়েত হইল। বাংলার জমিদারগণ তাঁহাদের প্রত্যেকটি হাতী বিনা ব্যয়ে সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এরূপ দৃষ্টান্তও জানি যে ইংরেজগণ তাহাদের হাতী সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সকলেই জানে যে, ঢাকায় যখন সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তখন জমিদারগণ কিভাবে তাহাদের লোকবল লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ...তাঁহারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাঁহাদের ক্ষমতানুসারে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।"[২]

(২) **মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা** : মহাবিদ্রোহের সময় সাধারণভাবে বঙ্গদেশের সমগ্র মধ্যশ্রেণীর নীরব দর্শকরূপে দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংরেজ শাসকদের জয় কামনা করিতেছিল। বিভিন্ন কারণে বঙ্গদেশের কৃষক এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই মধ্যশ্রেণীর পক্ষে নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিলে সমগ্র মধ্যশ্রেণী, অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর গ্রাম্য ও শহুরে এই উভয় অংশেরই স্বরূপ স্পষ্টরূপে উদঘাটিত হইত।

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে প্রগতিশীল শহুরে মধ্যশ্রেণীর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর মনোভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শহুরে মধ্যশ্রেণী আপন শ্রেণীর সমাজের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিলেও ইহারা প্রথম হইতে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ-সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইয়া ইংরেজের ভারত-জয়কে "ভগবানের মঙ্গল বিধান"[৩] বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং মহাবিদ্রোহে ইংরেজের পরাজয় তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। সমসাময়িক কালের শহুরে মধ্যশ্রেণী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করিলেও অনেকেই মহাবিদ্রোহের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি "স্বাধীনতার অগ্রদূত" বলিয়া কথিত কবি ঈশ্বর গুপ্ত, যিনি "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের

১। Burdwan Dist. Gazetteer. p. 38.

২। Indian Field. 11 Feb. 1859.

৩। সুশোভন সরকার : সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস (প্রবন্ধ, পরিচয়, 'সিপাহী-বিদ্রোহ' স্মারক সংখ্যা)

কুকুরও পূজা করিব" বলিয়া আস্ফালন করিতেন, তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নানা সাহেব, ঝাঁসীর রানী ও অন্যান্যের প্রতি কুৎসিত কটাক্ষ[১] করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। শহুরে মধ্যশ্রেণীর এই মনোভাব আকস্মিক বা ব্যক্তিগত কাপুরুষতার প্রশ্ন নহে, ইহার মধ্য দিয়া তাহাদের শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংরেজ শাসন যে উদ্দেশ্য জমিদার-গোষ্ঠীর সহিত এই মধ্যশ্রেণীকেও সৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল, মহাবিদ্রোহের সময় সেই উদ্দেশ্যের চরম সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তবে ইহাদের প্রগতিশীলতার অর্থ কি?

এই শহুরে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীলতা আপন সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনের জন্য তাহাদের "প্রগতিশীল" বলা হয়, সেই সংস্কার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল নিজেদের সমাজের মধ্যে, এবং সেই সংস্কারের প্রেরণা তাহারা লাভ করিয়াছিল ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ-সভ্যতার সম্পর্কের মারফত। তাই তাহারা ছিল ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজ-সভ্যতা ও ইংরেজ শাসনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরক্তিবশতই তাহারা মহাবিদ্রোহের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য সকলেই মহাবিদ্রোহের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার পরবর্তী কালেও, অর্থাৎ এই শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা না দেওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরক্তিই ছিল এই শ্রেণীটির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ-সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থার মধ্য হইতে, ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদারী ব্যবস্থারই একটি শাখারূপে এই শ্রেণীর জন্ম। ইংরেজ শাসনই ইহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং মহাবিদ্রোহের সময়ে এই শ্রেণীর সহিত ইংরেজ শাসনের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট এই শ্রেণীর শহুরে অংশটিকে ইংরেজ-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সংকট মহাবিদ্রোহের কালেও দেখা দেয় নাই। তাই ইহারা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার কথা কল্পনাও করিতে পারিত না, বরং ইংরেজ শাসনের ছায়াশ্রয়কেই ইহারা পরম কাম্য বলিয়া মনে করিত। তাই ইহারা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত মহাবিদ্রোহের প্রতি এত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলাদেশের তিতুমীর প্রভৃতি কৃষক-বীরগণ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বা তাহার পূর্বেও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও ইংরেজ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ ছিল এই তথাকথিত "প্রগতিশীল" বুদ্ধিজীবীগণের কল্পনারও অতীত।

(৩) **কৃষক-সম্প্রদায়** : বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণ মহাবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন,

১। সুকুমার মিত্র : ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ, ৩-৪ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশের কৃষক মহাবিদ্রোহে যোগদান না করিয়া নীরব দর্শক হিসাবে দূরে দণ্ডায়মান ছিল। আবার কোন কোন বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, চিরবিদ্রোহী বাংলার কৃষক দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়া মহাবিদ্রোহের সময় এতই "শ্রান্ত-ক্লান্ত" হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহাবিদ্রোহে যোগদানের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, তাই তাহারা সেই সময় নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ মাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যেই বাংলার এই তথাকথিত "শ্রান্ত-ক্লান্ত" কৃষক সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী আর একটি মহাবিদ্রোহ (নীলবিদ্রোহ) দ্বারা সর্বশক্তিমান ইংরেজ সরকারের সকল আইন, পুলিশবাহিনী ও সামরিক শক্তি দ্বারা সমর্থিত নীলকর-শোষণের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। বস্তুত, দীর্ঘকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়া আসিলেও মহাবিদ্রোহের কালেও বাংলার কৃষক "শ্রান্ত-ক্লান্ত" হইয়া নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান ছিল না, এই সময়েও তাহারা ছিল নীলকর দস্যুদল, জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসনের সহিত জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যস্ত।

মহাবিদ্রোহের কালে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও কৃষক জনসাধারণই ছিল একমাত্র সংগ্রামী শক্তি। সেই সময়, অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর যখন ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই নীলকর-শোষণের বিরুদ্ধে বহু খণ্ড খণ্ড স্থানীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলার কৃষক প্রদেশব্যাপী এক মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার কৃষক নীলকর দস্যুদের সহিত বুঝাপড়া করিতে এবং তাহাদের অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে এতই ব্যস্ত ছিল যে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া তাহাদের নিজ সংগ্রামের সহিত বাহিরের সংগ্রামের ঐক্যসাধন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষত, অসংগঠিত অর্ধসচেতন ও গ্রামাঞ্চলবাসী কৃষক-সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজ উদ্যোগে এই প্রকারের দুই সংগ্রামের বৈপ্লবিক ঐক্য সাধন কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহার জন্য যে সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপরিহার্য, তাহা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারতবর্ষে কল্পনাতীত বিষয়। সেই সময় বঙ্গদেশে এরূপ কোন নেতৃত্ব ছিল না, যাহা বাংলার কৃষককে মহাবিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান করিতে জানাইতে এবং তাহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিত।

তথাপি বঙ্গদেশের সংগ্রামী কৃষক যে মহাবিদ্রোহ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না, তাহারা যে নিজস্ব জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও নূতনভাবে ইংরেজ শাসনের উপর আঘাত দিতে উন্মুখ হইয়াছিল এবং সাধ্যমত মহাবিদ্রোহের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল, নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—

(১) সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম আরম্ভ কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুর হইতে, তাহার পরেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, অর্থাৎ মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের বিদ্রোহের তিনমাস পূর্বে বহরমপুরে অবস্থিত সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বহরমপুরের সিপাহি-বাহিনীর বিদ্রোহের সংবাদ শুনিবামাত্র বহু সহস্র স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিবার জন্য বহরমপুর শহরে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা অন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান না পাইয়া স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর, বহরমপুরবাসী ফেরেদুন খাঁর নিকটেই নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিল।[১] ইংরেজ ঐতিহাসিক কে (Kaye) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

> "সহস্র সহস্র মানুষ শহরে (বহরমপুরে শহরে—লেঃ) সমবেত হইয়াছিল। তাহারা যে ব্যক্তিটির নির্দেশ পাইলেই বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়িত, সেই ব্যক্তিটি[২] নিজে দুর্বল হইলেও একটি বিখ্যাত নামের মর্যাদায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন।"
>
> "ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে (নবাবের বংশধরকে—লেঃ) সম্মুখে রাখিয়া সিপাহীদের সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে দেখিতে না দেখিতে সমগ্র বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিত।"[৩]

(২) ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্যাক্ল্যাণ্ড তাঁহার (Bengal Under Lieutenant Governors) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

> সিপাহী বিদ্রোহের সময় "বঙ্গীয় সরকারের অধীনে এমন একটিও জেলা ছিল না, যাহা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে নাই, অথবা যেখানে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা ছিল না।"[৪]

(৩) বহরমপুরের বিদ্রোহের সংবাদ জানিবামাত্র কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র বিভাগে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়াছিল।[৫] শাসকগণ এই ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে-কোন সময় বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল ও চোয়াড়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।[৬]

(৪) "মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাংলার কৃষক এই ব্যাপারে অসহযোগিতাই করেছিল। জোর করে কৃষকের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে একটা Impressment Act পাস করতে হয়েছিল।"[৭]

(৫) মহাবিদ্রোহের প্রভাব যে বঙ্গদেশের কৃষকদের উপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, নীলবিদ্রোহের প্রধান নায়কদের নামকরণ হইতে তাহা প্রামাণিত হয়। সতীশ মিত্র মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, ১৪১ পৃ.।
২। স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর ফেরেদুন খাঁ।
৩। J W. Kaye : History of the Sepoy War, Vol. I. p. 498.
৪। C. E. Buckland : Vol. I. p. 68.
৫। Nadia Dist. Gazetteer : p. 32.
৬। Bankura Dist Gazetteer. p. 41.
৭। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

"সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নীলবিদ্রোহী কৃষকেরাও তাহাদের নেতাদিগকে এইসব নামে অভিহিত করিত।"[১]

সর্বশেষে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের ভাষায় বলা যায় :

"মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে—তথা শ্রেণী-স্বার্থে...ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তারাই তখনকার বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি নয় বা তারাই বাংলার একমাত্র ঐতিহ্যও নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশী সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না।...অন্য প্রদেশের মত বাংলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে সিপাহী ও কৃষকের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত করা বাংলাদেশে কঠিন কাজ হত না।...এ-কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে বাংলায় এই আরম্ভের কাজটা সফলভাবে হয়নি বলেই এখানে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেনি।"[২]

এইভাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত ভারতের একশত বৎসরের ইংরেজ শাসনকে ওলট-পালট করিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। মাত্র দুই বৎসরের অভ্যুত্থান স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া গেল, ভারতের ইংরেজ-শাসনের প্রকৃত রূপ। এই বিদ্রোহ যদি ধ্বংসোন্মুখ পুরাতন সামন্ত-রাজগণের নেতৃত্বে ও স্বার্থে পরিচালিত না হইয়া প্রকৃত বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ভারতের অগণিত জনসাধারণের, অগণিত কৃষকের স্বার্থে পরিচালিত হইত, তবে হয়ত বিদ্রোহের পরিণতি ভিন্নরূপ ধারণ করিত। পূর্বের প্রত্যেকটি বিদ্রোহের তুলনায় এই অভ্যুত্থানের ব্যাপকতা সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও এর স্থায়িত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। উপযুক্ত গণ-সমর্থন ও অংশগ্রহণের অভাবই এর প্রধান কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহী সিপাহীগণ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিল এক নূতন পথের সন্ধান।

১। সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা।

২। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, ১৪৫ পৃষ্ঠা।



মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ



Proclamation by the Queen in Council,

TO THE PRINCES, CHIEFS, AND PEOPLE OF INDIA.

Victoria,

BY THE GRACE OF GOD, OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, AND OF THE COLONIES AND DEPENDENCIES THEREOF IN EUROPE, ASIA, AFRICA, AMERICA, AND AUSTRALASIA

Queen, Defender of the Faith

Whereas, for [illegible] We have resolved, by and [illegible] advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in Parliament assembled, to take upon Ourselves the [illegible] of the Territories in [illegible] heretofore administered in trust for Us by the [illegible] EAST INDIA COMPANY.

Now, therefore, We [illegible] by these Presents notify and declare that, [illegible] advice and consent aforesaid, We have taken upon Ourselves the said [illegible] and We hereby call upon all Our Subjects within the said Territories to [illegible] and to [illegible] Allegiance to Us, Our Heirs and Successors, and to submit themselves [illegible]







[illegible] MIRROR.

[illegible] DEC. [illegible], 18[illegible]5.

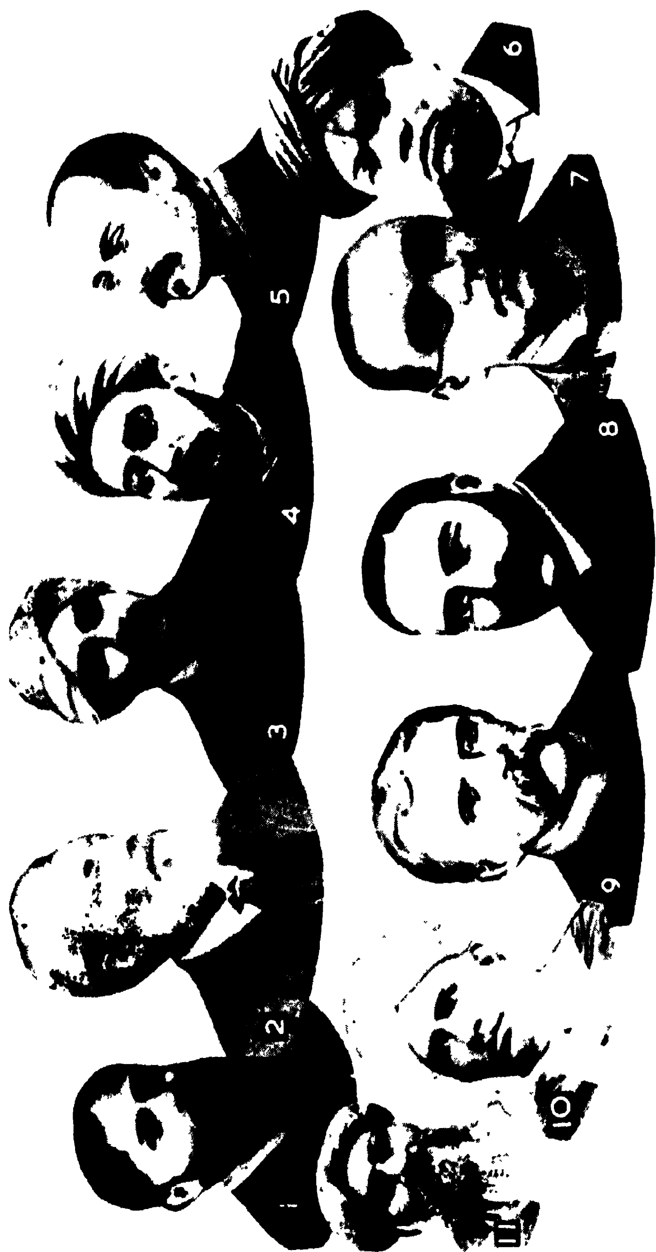
[illegible] FOR A NATIONAL CONGRESS IN INDIA.

[illegible] is constantly being thrown at our [illegible] by some of our Anglo-Indian friends [illegible] is no such thing as an Indian [illegible] and [illegible] that it will yet take a long [illegible] Indian nation as an entity. The Lieutenant-Governor of Bengal, who [illegible] almost to a patriarchal age [illegible] holds this idea, which he is fond of ostentatiously parading in season and out of season. That the idea is wholly without foundation, that we are as much a nation as, if not more than, the people of the British Isles, that we [illegible] living as a N[illegible] [illegible] of the present day is quite a different [illegible]





কংগ্রেস সভাপতিবৃন্দ (১৮৮৫-১৯০৫)



1. আনন্দমোহন বোস (১৮৯৮), 2. আলফ্রেড ওয়েব (১৮৯৪), 3. এন. জি. চন্দভাস্কর (১৯০০), 4. রহমতুল্লা সায়নি (১৮৯৬), 5. লালমোহন ঘোষ (১৯০৩), 6. পি. আনন্দ চারলু (১৮৯১), 7. রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯), 8. জর্জ যুল (১৮৮৮), 9. হেনরি কটন (১৯০৪), 10. সঙ্করণ নায়ার (১৮৯৭), 11. বদ্রুদ্দিন তিয়াবজি (১৮৮৭)।

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ

ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর ভারত শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মহাবিদ্রোহের পূর্বে বৃটিশ শাসকগণ ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেদের রাজ্যসীমা বর্ধিত করিয়া চলিয়াছিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে আর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। মহাবিদ্রোহের পূর্বেই উক্ত দুই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল। মহাবিদ্রোহের পর উহা হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শাসকগোষ্ঠী এবার তাহাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নীতি পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করে। মহাবিদ্রোহে ভারতীয় গণশক্তির বৈপ্লবিক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই বৈপ্লবিক গণশক্তির সহিত বুঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের নূতন নীতির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই নূতন নীতির সাহায্যেই তাহারা নবজাগ্রত গণশক্তির সহিত বুঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

মহাবিদ্রোহের সময় শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ভারতের গণশক্তির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম-শক্তি সামরিক বলের দ্বারা সাময়িকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হইলেও, এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করিয়া রাখা একাকী বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর সাধ্যাতীত এবং ইহার জন্য ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা অপরিহার্য। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী এবার ক্রমবর্ধমান গণশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মহাবিদ্রোহের মধ্যেই ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির ভারতীয় সামন্তরাজ্যগুলি গ্রাস করিবার নীতি এবং সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগোষ্ঠীর অধিকৃত কৃষিভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিবার নীতি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহাবিদ্রোহের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সামন্ত রাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীর শত্রুতা অপেক্ষা মিত্রতাই শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে অধিক লাভজনক। কারণ, সামন্ত রাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীকে কৃষক-শোষণের অবাধ সুযোগ দিলে, মহাবিদ্রোহের মত আবার কোন বিদ্রোহ যদি দেখা দেয় তবে এই সামন্ত রাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীই বৃটিশ শাসনকে কৃষকের বৈপ্লবিক আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে, তাহারাই হইবে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পরেই বৃটিশ শাসকগণ সামন্ত রাজন্যবর্গ ও জমিদারগোষ্ঠীর সহিত বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এই বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সহিত নূতন কৃষি-

সম্পর্ক স্থাপন করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কৃষি-ভূমির উপর সামন্ত রাজন্য ও জমিদারগোষ্ঠীর অবাধ দখলীস্বত্ব ও কৃষক শোষণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠাই সেই নূতন কৃষি-সম্পর্কের মূল বিষয়বস্তু।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে ভারতের জনসাধারণের উপর প্রাচীন রাজন্যবর্গের প্রভাব অতি গভীর। এত দিনের বৃটিশ বণিকগোষ্ঠীর উন্মত্ত শোষণ ও শাসনের ফলে এই প্রভাব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষত মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের পর ভারতের জনসাধারণ প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু প্রাচীন সামন্ত রাজন্যবর্গই যে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ তাহাও উপলব্ধি করিতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং মহাবিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই ভারতের বৃটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করে। কেবল পূর্বের রাজন্যবর্গের রাজ্যগ্রাসনীতিই বন্ধ হইল না, ইহাদের স্বাধীন, সার্বভৌম নরপতি বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বুকের উপর ''শতবর্ষব্যাপী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরও একটি নিকৃষ্টতম কুশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।'[১] পাঁচ শতাধিক করদ ও মিত্ররাজ্যে চিত্রিত হইয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি উৎকট রূপ ধারণ করিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে যে সামান্য সামাজিক সংস্কারের কার্য আরম্ভ করিয়াছিল তাহা এই সময় হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সুরক্ষিত করিবার নীতি গৃহীত হয়।[২] মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় ''ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার'' দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হয় এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলিকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ''ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার সর্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত করা হইবে।'' '১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের রাজকীয় অধিকার আইন' (The Royal Titles Act of 1876) দ্বারা ইংলণ্ডের রানীকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পর বৎসর বড়লাট লর্ড লিটন এই আইনের ব্যাখ্যা করিয়া ঘোষণা করেন :

> 'ইংলণ্ডেশ্বরী যে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিজাত-সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র রক্ষক, তাহাই এই আইন দ্বারা সূচিত হইতেছে।''[৩]

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই ছিল মহাবিদ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। বৃটিশ

১। K. S. Shelvankar : Problems of India. p. 81

২। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের বৃটিশ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল কার্য হইল '১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বিবাহের সম্মতি দানের বয়স সম্বন্ধীয় আইন' (Age of Consent Act of 1891) পাশ। এই আইনে কন্যার বিবাহের বয়স ১০ বৎসর হইতে বর্ধিত করিয়া ১২ বৎসর করা হয়।

৩। R. P. Dutt : India Today. P. 287.

শাসকগণ এবার ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম-শক্তির এই মূল উৎসটিকে চিরকালের জন্য বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় হইতেই ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলিতে থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ— এই একশত বৎসরকাল মুসলমান জনসাধারণ বৃটিশ শাসকশক্তির সহিত বিরোধিতা ও সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াছিল; 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' প্রভৃতি বহু গণবিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপর দিকে, বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই হিন্দু-সম্প্রদায় ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন।[১]

মহাবিদ্রোহের পর হইতেই এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হিন্দু মূলধনিশ্রেণীর আবির্ভাব এবং ইহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বৃটিশ শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং অপরদিকে চির-বিদ্রোহী মুসলমান-সম্প্রদায়কে শিক্ষা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া তাহাদিগকে নবজাগরণোন্মুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময় হইতেই শাসকগোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।[২]

ভারতীয় মূলধনিশ্রেণীর জন্ম

ভারতের সভ্যতা প্রধানত কৃষিভিত্তিক। গ্রামাঞ্চল ও রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়াই এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র ছিল একটি সংযোগ সাধক প্রতিষ্ঠান মাত্র। গ্রামাঞ্চলের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্যই ইহাকে কৃষির পক্ষে অপরিহার্য দেশব্যাপী সেচ-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। কারণ, কৃষিকার্য ব্যতীত সমগ্র দেশ ও রাষ্ট্র অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু কৃষিকার্যকে সচল রাখার ব্যবস্থা দ্বারা প্রাচীন সমাজকে বাঁচাইয়া রাখা ব্যতীত আর কোন উদ্যোগ বা প্রয়াস সেকালের রাষ্ট্রের ছিল না। ইহার ফলে সেকালের সমাজ একটি অচলায়তন রূপে টিকিয়া ছিল।

কার্ল মার্কস্ তাঁহার 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে[৩] এই সমাজ-ব্যবস্থাকেই "এশিয়ার উৎপাদন-প্রণালী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুদূর প্রাচীন যুগ ও য়ুরোপীয় সামন্ত-প্রথার সহিত এই সমাজের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। য়ুরোপে সামন্ততন্ত্রের গর্ভ হইতেই বুর্জোয়াশ্রেণী বা

১। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। পৃ. ৩৭১।

২। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। পৃ. ৩৭১।

৩। Karl Marx : Capital (Kerr Ed.) Vol. I. p. 391-92 : The East India Company (Article) : Future Results of British Rule in India (Article).

মূলধনিশ্রেণীর জন্ম হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের এই বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতিই এরূপ ছিল যে, ইহা হইতে বুর্জোয়া বা মূলধনিশ্রেণীর জন্ম কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না।

> "ইহা (ভারতীয় সামন্তপ্রথা—লেঃ) ছিল এরূপ একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থা যাহার তুলনা য়ুরোপের সমাজে মিলে না। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ছিল সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। তাহার ফলে ইহা ছিল চিরকাল নীতিবিগর্হিত কলুষতার অতলগর্ভে নিমজ্জিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোনই পবিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং য়ুরোপের সামন্তপ্রথার সহিত ইহার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও য়ুরোপীয় সমাজের মত কোন প্রকারের কোন পরিবর্তনই এখানে দেখা দেয় নাই। আর য়ুরোপের সমাজের মত এই ভারতীয় সমাজে ধনতন্ত্রের জন্মলাভের প্রশ্নই উঠে না।"[১]

> "ভারতবর্ষের অর্থনীতি যে বিকাশ লাভ করে নাই, প্রাচীন অর্থনীতির কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহার প্রধান কারণ ছিল শিল্পের মালিক ও ব্যবসায়িশ্রেণীগুলি দ্বারা পরিচালিত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, আর রাষ্ট্র, এবং উহার প্রতিনিধি ও কর্মচারিবৃন্দের স্থায়ী অন্তর্বিরোধ।"[২]

বৃটিশ শাসন এই অচলায়তন ভাঙিয়া ভারতবর্ষের সমাজকে মুক্ত করে। এই শাসন বিপুল রাজনীতিক ও আর্থনীতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাচীন সমাজের ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং এইভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। ভারতবর্ষ নিজে স্বাভাবিকভাবে যাহা করিতে পারে নাই, বৈদেশিক শাসন তাহা সহজেই করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বৃটিশ শাসন কেবল আভ্যন্তরিক বাজারই ক্রমশ সংহত করিয়া তোলে নাই, নিজ প্রয়োজনে ভারতীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন উপাদানগুলিকেও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। নিজেদের প্রয়োজনেই বৃটিশ শাসন সেই উপাদানগুলির ভিত্তিতে গঠিত ভারতের নূতন অর্থনীতিকে বৃটেনের স্বার্থের জোয়ালে আবদ্ধ করিয়াছে। বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহু প্রাচীনকালের। কিন্তু বৃটেনের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এরূপ বিপুল আকার ধারণ করে যে তাহা পূর্বে কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারিত না। এই ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। কারণ, ইহা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন এবং ইহা একদিকে বৃটেনের অভাবনীয় সমৃদ্ধির এবং অপর দিকে ভারতবর্ষের জনজীবনের সর্বাত্মক ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে। ভারতবর্ষের সমস্ত আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ বৃটেনকে কেন্দ্র করে গড়িয়া উঠা আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

এই নূতন অবস্থা হইতে একটি বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি দেখা দেয়। ভারতের ব্যবসায়ি মূলধন ভূস্বামীশ্রেণীর দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু ইহা শত-

১। K. S. Shelvankar : Problem of India, p. 165.
২। K. S. Shelvankar : Ibid, p. 166.

সহস্রগুণ উন্নত ও শক্তিশালী বৃটিশ মূলধনের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ভারতের ব্যবসায়ি মূলধনীরা এতকাল ছিল ভূস্বামীগোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ, এবার তাহারা হইল বৃটিশ মূলধনীদের আজ্ঞাবহ। পূর্বে ভারতের ভূস্বামীগোষ্ঠী এই ব্যবসায়িশ্রেণীকে বিকাশ লাভ করিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। আর এবার বৃটিশ মূলধনীরাও ইহাদিগকে শিল্প গড়িয়া তুলিবার এবং তাহার মারফত বিকাশ লাভের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাদিগকে কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা ও মহাজনী ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা লাভের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। অবশ্য বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নূতন অর্থনীতির প্রচলন ও নূতন ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে এই ভারতীয় ব্যবসায়িশ্রেণী মহাজনী ব্যবসা দ্বারা মুনাফা লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ লাভ করে।

কালক্রমে এই ব্যবসায়িশ্রেণী এইভাবে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়। তাহার পর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি, বৃটেনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপদ-আপদের সুযোগ লইয়া এই সম্পদশালী ব্যবসায়িগোষ্ঠী সর্বপ্রথম বস্ত্রশিল্প স্থাপন করিয়া ভারতীয় মূলধনী বা বুর্জোয়াশ্রেণী রূপে আবির্ভূত হয় এবং শীঘ্রই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত তাহাদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়।

*　　　*　　　*

প্রধানত বৃটিশ বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়াই ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহারা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র গোমস্তারূপে য়ুরোপে কাঁচা তুলা ও চীনদেশে আফিম রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করে। এই ব্যবসায়িগণ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী পার্শী সম্প্রদায়। এই ব্যবসায়ের মারফত পার্শী সম্প্রদায় বিপুল ধনসম্পদ আহরণ করে এবং ক্রমশ এই ধনসম্পদ স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।[১]

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতীয়দের এই ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে তুলা আমদানি করিত। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেই তুলা-আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে বৃটিশ বস্ত্রশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে।[২] এই গৃহযুদ্ধের ফলে তুলার জন্য বৃটেনকে বাধ্য হইয়া বোম্বোইয়ের ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহার ফলে ভারতীয় তুলার রপ্তানি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ডি. ই. ওয়াচা লিখিয়াছেন :

"ইংলণ্ডের লিভারপুর বন্দরে তুলা রপ্তানি হইতে যে বিপুল মুনাফা লাভ হয় তাহার

১। S. Upadhyay : Growth of Industries in India, p. 45-46.

২। D. E. Wacha : A Financial Chapter in the History of Bombay. p. 3

সর্বাধিক অংশ যায় বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে।" ইনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই তুলার ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের মোট মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা।[১]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সি. এন. দাভার নামক এক ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরীতে একটি বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বস্ত্রশিল্প। প্রথমে ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩টি। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১টি। এই শিল্পগুলির অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ের শহরাঞ্চলে এবং বাকি অর্ধেক স্থাপিত হয় নাগপুর, শোলাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বঙ্গদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে। বোম্বাই প্রদেশের বাহিরে বস্ত্রশিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে নাগপুর।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি এবং ইহার শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ৪৪ হাজার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৮৭টি। এই সময় এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্পের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৯৩টি, মোট শ্রমিক-সংখ্যা হয় ১ লক্ষ ৬২ হাজার এবং মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৬ কোটি টাকা।

এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পেব প্রসার অতি দ্রুত হইলেও ইহার গতি কোন সময়েই ব্যাহত হয় নাই এবং ইতিমধ্যে কোন গুরুতর শিল্প-সংকটও দেখা দেয় নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ এবং একটি মূলধনী শিল্পপতিশ্রেণীর আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অবস্থাও দেখা দিতেছিল। এই আনুষঙ্গিক অবস্থা হইল শিল্পপতিদের একটি সহায়ক শ্রেণীর আবির্ভাব। ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত একটি সহায়ক শ্রেণীর আবির্ভাব। নূতন ও উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীই ভারতের নূতন শিল্পপতিদের সেই সহায়ক শ্রেণী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প-পরিচালক প্রভৃতিদের লইয়া এই মধ্যশ্রেণীটি গঠিত। এই শ্রেণীটি যে ভূমিকা লইয়া দেখা দিয়াছিল সেই ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

> "এই শ্রেণীটি ছিল নাগরিকত্ব সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক শিল্প ও পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এই আরম্ভ অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই নূতন শ্রেণীটি আবির্ভূত হইয়া অনিবার্যভাবেই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অসম প্রতিযোগী রূপে এবং ইহার অগ্রগতির পথে দুরতিক্রম্য বাধারূপে দেখিতে পাইল। সুতরাং এই শ্রেণীটির কণ্ঠেই প্রথম ভারতের জাতীয় দাবি ধ্বনিত হইল, ইহাদের উপর অর্পিত হইল এই জাতীয় দাবির নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব।"[২]

১। D. E. Wacha : Ibid. p. 28-29.

২। R. P. Dutt : India Today. P. 288.

বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনের সংঘাত

ভারতবর্ষে যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে একমাত্র বস্ত্রশিল্পই ছিল ভারতীয় মালিকদের অধিকারে। এই শিল্প এবং ভারতীয় মালিকশ্রেণীর জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণের, বিশেষত ইংলণ্ডের প্রবল প্রতাপান্বিত বস্ত্র-শিল্পপতিদের মধ্যে এক ভয়ংকর আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রথম হইতেই ভারতীয় শিল্পের প্রসার রোধ করিবার জন্য তাহারা চিৎকার আরম্ভ করে এবং ইহার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তাহারা ভারত-সরকারকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। তাহাদের চাপে ভারত-সরকার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর বসাইয়া দেশীয় শিল্পের প্রসারে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই ইংলণ্ডের পশমী, তুলাজাত ও রেশমী বস্ত্র, সূতা এবং বিভিন্ন ধাতুদ্রব্যের আমদানি-শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া ভারতের বাজার অধিকার করিবার জন্য ইংরেজ-বণিকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। অন্যদিকে যাহাতে ভারতের কাঁচামাল সহজেই ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যায় তাহার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার ফলে একদিকে বৃটিশ পণ্য ভারতের বাজার ভরাইয়া ফেলে এবং তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, অপর দিকে ভারতের কাঁচামাল অল্প মূল্যে লাভ করিয়া বৃটিশ শিল্প দ্রুত বাড়িয়া উঠে।[১] এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার ভারতে অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে। এই অবাধ বাণিজ্যের নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইংরেজ অর্থনীতিবিদ বুকানন সাহেব বলেন :

> "অবাধ বাণিজ্যই ছিল ভারত-সরকারের সুপরিকল্পিত নীতি, এই নীতি দ্বারা বৃটিশ ব্যবসা ও শিল্পের জন্য ভারতের বাজার সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। ভারতীয় শুল্কের ইতিহাসে ম্যাঞ্চেস্টারের মালিকগোষ্ঠীর প্রভাব গভীর দাগ কাটিয়া রাখিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক-মালিক ও জাহাজ-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ভারতীয় বাজার সংরক্ষিত করিবার জনাই তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।"[২]

ভারত-সরকারের মুদ্রানীতি এবং সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও এই উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও ভারত-সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতিই অনুসরণ করিয়া চলে। এই অবাধ বাণিজ্য-নীতির ফলে বৃটিশ পণ্য অবাধে ভারতের বাজার ভরাইয়া ফেলে, আর ভারতের নবজাত শিল্পের পণ্য অল্প দামের বৃটিশ পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া বাজার হারাইয়া ফেলে। ইহার ফলে ভারতের নবজাত শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উহার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। উক্ত

১। Reginald Reynolds : White Shahibs in India, p. 109-110.

২। D. H. Buchanan : The Development of Capitalist Enterprise in India p. 464-65.

সময়ে বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর সাধারণভাবে শতকরা দশ টাকা হারে শুল্ক বসান ছিল, কিন্তু বৃটিশ পণ্যকে এই শুল্কের বাধা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য ইহার উপর নামমাত্র শুল্ক বসান হয়। ভারতবর্ষের বিশাল বাজার হইতে ভারতের ও অন্যান্য দেশের পণ্য বিতাড়িত করিয়া ইহাকে বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করাই ছিল এই নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দমনের ব্যয় মিটাইতে গিয়া ভারত সরকারের বাজেটে বিরাট ঘাটতি দেখা দিলে ভারত-সরকার বৃটিশ পণ্যের আমদানির উপরেও সামান্য শুল্ক বসাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ করিয়া, অর্থাৎ শুল্ক রদ করাইবার জন্য ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করে তাহার নিকট ভারত-সরকার মাথা নত করিতে বাধ্য হয় এবং ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠীকে শান্ত করিবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষে অপরিহার্য লম্বা আঁশযুক্ত তূলার আমদানির উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করে। ভারতবর্ষে লম্বা আঁশ-যুক্ত তুলা জন্মে না বলিয়া ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। ইহার আমদানিতে বাধা দিবার অর্থ হইল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কিন্তু ইহাতেও ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠী শান্ত হইল না, তাহারা আরও প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক্ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি বৃটিশ পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক তুলিয়া লওয়া হয়, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার মদ ও লবণ ব্যতীত ইংলণ্ডের বস্ত্র ও অন্যান্য সকল পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেও বৃটিশ মালিকগোষ্ঠী সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রসার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে উৎপাদন-কর বসাইবার জন্য প্রবলভাবে চাপ দিতে থাকে। ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, ভারত সরকার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর বসানো উৎপাদন-কর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হইতে বাড়াইয়া পাঁচ টাকায় পরিণত করে।[১]

এই বর্ধিত করভার ও বৃটিশ পণ্যের অবাধ আমদানি একত্রে মিলিয়া ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। মাদ্রাজে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই করভার কিভাবে ভারতীয় শিল্পের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহার একটি নগ্নচিত্র জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য হইতেই পাওয়া যায় :

> "এই করভার চাষী ব্যতীত সকলের উপরেই চাপানো হইয়াছিল।...এমনকি যে বৃদ্ধা বাজারে গিয়া পথের এক কোণে বসিয়া শাক-সব্জি বিক্রয় করে তাহার উপরেও কর বসান হইয়াছে।...কিন্তু কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উপর কর বসানো হয় নাই। যদি কোন লোক বৎসরে কয়েকটি টাকাও আয় করে তবে তাহাকেও কর দিতে হয়, কিন্তু তাহার পাশের

১। S. Upadhyay : Growth of Industries in India, p. 52-53.

২। Evidence of I. W. B. Dykes, House of Commons Fourth Report.

বাড়ীর যে ইংরেজ বণিক শত শত টাকা আয় করে তাহাকে কোন কর দিতে হয় না।"[১]

এইভাবে "ভারতের নবজাত শিল্পের উপর কর বসানো, রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের একচেটিয়া প্রভুত্ব রক্ষা করা এবং সাধারণভাবে ভারতীয় ধনতন্ত্রের আর্থনীতিক বিকাশে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজ শাসকগণ দেশীয় মালিকদিগকে রাজনীতিক সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য করে।"[১]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মূলধন গড়িয়া উঠে এবং সেই মূলধন প্রধানত তূলা ও পাটশিল্প, আন্তঃ-প্রাদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে লগ্নি করিয়া ভারতীয় মালিকগণ ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর দ্বারা ভারতীয় জনবল ও ধন-সম্পদ শোষণে বাধাদান করা। কারণ, ইহা ব্যতীত ভারতীয় মালিকদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ ছিল না।

প্রথম হইতেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মূলধনের দ্বারা এবং ভারতীয় মূলধনীদের দ্বারাই ইহা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ভারতীয় শিল্পটি প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়াছিল এবং ইহাকে বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠী ও বৃটিশ সরকার ভারতের এই নূতন বস্ত্রটিকে সমূহে বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। ভারতের নূতন শিল্পপতিশ্রেণীর মধ্যে এই মৌলিক আর্থনীতিক সংঘাত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই তীব্র আকারে দেখা দেয়। ভারতে বৃটিশ বস্ত্রের উপর যে আমদানি-শুল্ক বসানো ছিল তাহা বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর দাবি অনুসারে ভারত সরকার ঐ বৎসর তুলিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতের নূতন বস্ত্রশিল্পকে বহুগুণ উন্নত বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহার তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সংকট

"যে নীতি অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের জনসাধারণের মধ্য হইতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে শিক্ষিত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল, ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও তাহাদের বিক্ষোভ সেই নীতিরই অনিবার্য পরিণতি। শাসন-বিভাগের যে সকল পদ ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক বা অর্থকরী নয়, সেই পদগুলি পূর্ণ করাই ছিল এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিকে

১। Joan Beauchamp : British Imperialism in India. p. 164.

গড়িয়া তোলার পিছনের উদ্দেশ্য। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রয়োজনাতিরিক্ত 'বাবু' (কেরানী)-সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা সরকার কেরানীদের শ্রমের ব্যয় (বেতনের হার) সকল সময়ে নিম্নমুখী করিয়া রাখিয়াছিল।"[১]

ইংরেজ শাসনের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বেতনের কেরানীকুলের দুর্দশাও ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে থাকে। ইহার উপর প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তোলে। ক্রমশ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের সকলের চাকরি লাভের সম্ভাবনা লোপ পায়। সুতরাং বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলে। কারণ,—

"শাসন-বিভাগের লাভজনক উচ্চপদগুলি ইংলণ্ড হইতে আমদানি-করা ইংরেজদের একচেটিয়া হইয়া থাকিত, আর অন্য চাকরির দরজাও তাহাদের নিকট বন্ধ ছিল। তাহাদের বড় একটা অংশ গেল আইন পড়িতে, কিন্তু শীঘ্রই যুবক-উকিলের সংখ্যা মোট মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা ছাড়াইয়া গেল এবং বেকার উকিলে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্য যে সকল চাকরির দরজা তাহাদের নিকট খোলা ছিল তাহা হইল বিলাতী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মাল-গুদাম ও সরকারী অফিসের চাকরি আর কেরানীগিরি। কিন্তু এখানেও কেরানীর চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশী এবং বেতনের হার অবিশ্বাস্য রকমে নীচু। সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষা শেষ করিবার পর ভারতীয় ছাত্রগণকে অনিবার্য বেকারির মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়, না হয় তাহারা কোন অফিসে জীবিকার মান অপেক্ষাও অল্প বেতনে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাই যেন তাহাদের বিধিলিপি।"[২]

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে, বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলেও সেইগুলির শিক্ষকের পদও ক্রমশ পূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা ব্যতীত ভারতীয় শিক্ষকদের বেতনের হার অত্যন্ত নীচু। তাহার ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও চরম আর্থিক দুর্দশা দেখা দিল। শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র ভেরিনি লোভেট-এর কথায় "সাধারণ স্তরের স্কুল-শিক্ষকদেব সংখ্যা অত্যধিক, তাহাদের বেতন সামান্য। বাঁচিবার শেষ উপায় হিসাবেই তাঁহারা এই চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিক্ষোভের অন্ত নাই।"[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই বেকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। বৃটেনের আর্থিক সংকট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইংরেজদের ভারত-শোষণ আরও উগ্র হইয়া উঠে। শাসকগোষ্ঠী তাহাদের আর্থিক সংকটের সকল বোঝা ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদের জীবন ধারণের সকল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে একটা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ সমগ্র

১। Reginald Reynolds : White Shahibs in India, p. 113.
২। Lester Hutchinson : Empire of the Nabobs, p. 189.
৩। Vereney Lovett : History of the Indian National Movement, p. 232.

ভারতের উপর স্থায়ী হইয়া বসে। কেবলমাত্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেই পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দেয় এবং তখন হইতে দুর্ভিক্ষই ভারতের সাধারণ অবস্থায় পরিণত হয়। কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর সম্মুখে ধ্বংসের ছবি ফুটিয়া উঠে।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এই চরম আর্থিক দুর্দশা তাহাদের মধ্যেও একটা ব্যাপক বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। তাহাদের আর্থনীতিক দুর্দশা চরম জাতীয়তাবাদের মধ্যে রাজনীতিক রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, বিদেশী ইংরেজ শাসনই তাহাদের দুঃখদুর্দশা ও জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ। এই বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করিয়া তোলে। ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশের, স্কুল-কলেজগুলি হইয়া উঠে সেই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল. আর সেই স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ এক নূতন বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচার-কার্যে অবতীর্ণ হন। এইভাবে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয় এবং সেই বীজ দ্রুত বাড়িয়া উঠে। চরম আর্থনীতিক দুর্দশাই যে মধ্যশ্রেণীর সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান উৎস তাহা শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্রগণও স্বীকার করিয়াছেন। ঝানু আমলাতান্ত্রিক লেখক ভেরিনি লোভেটের কথায় :

> "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বাঙলাদেশের স্কুল-কলেজগুলিতে বৈপ্লবিক ভাবধারা এরূপ বিস্তার লাভ করিবার আংশিক কারণ হইল এই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সামান্য বেতন। ভয়াবহ দারিদ্র্য ও জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত সাহিত্য দ্বারাই তাঁহাদের মনোভাব গড়িয়া উঠে। অনেক সময় তাঁহারা আবার সাংবাদিকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং তাহার মারফত তাঁহাদের এই ভাবধারা প্রচার করিয়া সামান্য জীবিকা উপার্জন করেন।"[১]

কৃষি-সংকট ও কৃষক-বিক্ষোভ

ভারতে ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতে যে কৃষি-সংকট দেখা দিয়াছিল, তাহা মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে চরম আকার ধারণ করে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতব্যাপী এক কৃষি-বিপ্লবের অবস্থা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বিভিন্ন সরকারী তথ্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কৃষির যে ভয়ঙ্কর চিত্র উদঘাটিত হয় তাহা নিম্নরূপ :

বোম্বাই প্রদেশ : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র শাসনকালের প্রথম যুগে বোম্বাই প্রদেশের কৃষকদের মোট রাজস্ব দিতে হইত ৮০ লক্ষ টাকা; মহারানীর রাজত্বকালে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত রাজস্বের অর্থ সংগ্রহের জন্য কৃষকগণকে সাহুকার ও ভাটিয়া মহাজনগণের নিকট চিরদাসত্ব বরণ করিতে হইত।[২]

১। Vereney Lovett : History of the Indian National Movement. p. 233.
২। সখারাম গণেশ দেউস্কর : দেশের কথা, ১১২ পৃষ্ঠা।

মাদ্রাজ প্রদেশ : "কোম্পানীর আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলে যে ভূমি-রাজস্ব আদায় হইত, মহারানীর আমলে তাহা অপেক্ষা দশ লক্ষাধিক টাকা বা এক-তৃতীয়াংশ অধিক রাজস্ব আদায় হইতেছে।...রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"[১]

১৮৮৯ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাকি খাজনার দায়ে মাদ্রাজ সরকার ৮,৪০,৭১৩ জন কৃষকের ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় করে। ইহা ব্যতীত আরও ১২ লক্ষ বিঘা জমি ক্রেতার অভাবে মাদ্রাজ সরকারকেই ক্রয় করিতে হয়।[২]

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশের সকল জেলায় শতকরা ১০২ হইতে ১০৫ হারে কৃষকদের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকদের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করিয়াছে।[৩]

পাঞ্জাব প্রদেশ : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়।" পাঞ্জাবের কমিশনার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটকে লিখিয়া পাঠান :

> "পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানেই কৃষিজীবীদের প্রায় অর্ধাংশ হয় সর্বস্বান্ত, না হয় গভীর ঋণের পঙ্কে নিমগ্ন।"

থরবার্ণ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, ১২ খানি গ্রামের ৭৪২টি পাঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর সর্বস্বান্ত হইয়াছে। "১২৬খানি গ্রামের অর্ধেক কৃষক এরূপ গভীর ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদের আর উদ্ধারের আশা নাই।" থরবার্ণের মতে, রাজস্বের অতি উচ্চ হার এবং উহা আদায়ের কঠোরতাই কৃষকের এই দুর্দশার জন্য দায়ী।[৪]

অযোধ্যা প্রদেশ : "শতকরা ৭৫ জন কৃষকের গৃহে খাদ্য নাই, শীতের জন্য লেপ বা কম্বল নাই।—প্রায়োপবাস এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে।"[৫]

বিহার প্রদেশ : "প্রায় ৬ লক্ষ লোকের প্রতিজনকে মাত্র ১৭ টাকায় সারা বৎসর জীবন ধারণ করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোককে মাত্র দুই বিঘা করিয়া জমি চাষ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়।...শতকরা দশ বারো জনের জমিজমা নাই, তাহারা কেবল মজুরি করিয়া দিনপাত করে। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে ৮ মাসের অধিক কাল কোন কাজ পায় না। মজফফরপুর, সারণ, চম্পারণ ও দ্বারবঙ্গের অনেক অংশে শ্রমজীবীদিগকে অর্ধভুক্ত অবস্থায় কাল যাপন করিতে হয়।"[৬]

১। Editorial, The Englishman : 17 Feb. 1880 (দেশের কথা, ১১৪ পৃষ্ঠা।)
২। Statement by G. Rogers in Madras Legislature (দেশের কথা, ১১৪ পৃ.)।
৩। Statement By Bepin Krisna Basu in Indian Council (দেশের কথা, ১১৫ পৃ.)।
৪। Thorburn (দেশের কথা, ১১৭-১৮ পৃ.)।
৫। Ibid (দেশের কথা, ১২৪ পৃ.)
৬। Report by Toyenby. Commissioner of Patna (দেশের কথা, ১৩৬-৩৭ পৃ.)।

বঙ্গদেশ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ইচ্ছামত কৃষকের ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে না পারিলেও 'পথকর', 'চৌকিদারী-কর', 'পূর্তকর' প্রভৃতি বসাইয়া জমিদারী শোষণের উপর সরকারী শোষণের বিপুল ভার চাপাইয়া দিয়াছে।

শস্য-শ্যামল বঙ্গদেশে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কৃষকসমাজ অন্নকষ্টে অত্যন্ত পীড়িত না হইলেও, ডিগ্‌বী সাহেবের (William Digby) মতে, "বাঙলাদেশের সকল শ্রেণীর লোকের বার্ষিক গড় আয় ১৫ টাকা ৩ আনা মাত্র। অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই সুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে, ফলে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় প্রতি বৎসরই বাঙাদেশের মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখাদ্যের অভাবে ও শিশুদের যকৃতের রোগে মৃত্যু ঘটিতেছে।"[১]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ইংলণ্ডের বার্মিংহাম শহরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের ২০ কোটি মানুষের মধ্যে চারি কোটিরও অধিক মানুষ অর্ধাশনে জীবনযাপন করে। বঙ্গদেশের ছোটলাট চার্লস ইলিয়ট ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন :

> "আমি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে সে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।"[২]

ফয়জাবাদের কমিশনার হ্যারিংটন সাহেব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :

> "কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার নিজের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকই বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারের অভাবে কষ্ট পাইতেছে।"[৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের, বিশেষত শেষ ত্রিশ বৎসরের এই অতি ভয়ঙ্কর কৃষক-শোষণের অনিবার্য পরিণতি ঘটিয়াছে সাধারণ লোকক্ষয়ে এবং লোকক্ষয়কারী মহাদুর্ভিক্ষে। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে লোকক্ষয়ের হিসাব নিম্নরূপ : বিহার প্রদেশে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার, পাঞ্জাব প্রদেশে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার এবং এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও বারাণসী জেলায় ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শত ৮৫ জন। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত ৩১ জনের এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৫৫ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।[৪]

১। William Digby : Prosperous India. p. 213.
২। সখারাম গণেশ দেউস্কর, : দেশের কথা, ২৭ পৃষ্ঠা।
৩। দেশের কথা, ১২৩ পৃষ্ঠা।
৪। দেশের কথা, ১৩৩ ও ১৪০ পৃষ্ঠা।

ইংরেজ শাসনকালে প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসর দুর্ভিক্ষের অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে, ১৮০১ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দুর্ভিক্ষে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর ১৮৬০ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ষোল বৎসরে ভারতবর্ষে ছয়বার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এবং তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষাধিক ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।[১] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাত্র সাতটি দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, এবং তাহাতে মোট সাড়ে বারো লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল চব্বিশ বার এবং তাহার ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ মানুষের। এই চব্বিশটি দুর্ভিক্ষের আঠারোটি দেখা দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে।[২]

ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছেন :

> "প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বহুকষ্টে অনশন-পীড়িত মানুষের প্রাণ-রক্ষার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু নিত্য অনশন-ক্লিষ্ট প্রজাসমূহের যে প্রতি বৎসর রোগের প্রকোপে ও কালের আক্রমণে অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার করিতে সরকার অসমর্থ।"[৩]

* * *

কৃষি ও কৃষক-সম্প্রদায়ের এই মহাবিপর্যয় অনিবার্যভাবেই ভারতব্যাপী কৃষকের এক মহাবিদ্রোহ আসন্ন করিয়া তুলিল। ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হইল। ভারতের এক প্রান্তে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ' এবং অপর প্রান্তে, বঙ্গদেশে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের 'পাবনা (সিরাজগঞ্জ) বিদ্রোহ' ভারতব্যাপী কৃষকের সেই মহাবিদ্রোহের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। ভারতের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সেই ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতে দিশাহারা হইয়া ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে "একটা কিছু" করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। শাসকশ্রেণীর পক্ষ হইতে এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ হইল সেই "একটা কিছু" করিবার শশব্যস্ত প্রয়াস।

অপর দিকে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পকে ইংলণ্ডের বহুগুণ শক্তিশালী বস্ত্রশিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের নবজাত শিল্পপতি-শ্রেণীও উহার সহকারী বুদ্ধিজীবীদের মারফত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। এবার তাহারা শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্যোগের সক্রিয় অংশীদাররূপে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে যোগদান করে।

১। দেশের কথা ১৩৩ ও ১৩৬ পৃষ্ঠা।

২। R. P. Dutt. India Today. p. 288.

৩। W. W. Hunter : Imperial Gazetteer of India. Vol. IV. p. 164.

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর একদিকে ভারতের উপর বিজয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ শাসকগণের উৎপীড়ন ও শোষণের বন্যা বহিতে থাকে এবং অপর দিকে উহার ফলে ভারতীয় সমাজের সকল দিকে একটা আলোড়ন আরম্ভ হয়। সেই আলোড়নের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এক নূতন ভারতবর্ষের, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক নূতন জাতির জন্ম আরম্ভ হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়া পুরাতন সামন্তশ্রেণীর ইংরেজ বিরোধীতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে চিরপুরাতন ধর্ম ও সংস্কারের বাধাও বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাহার পরিবর্তে নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে বিভিন্ন আর্থনীতিক শ্রেণী। তাহারা সঙ্গে লইয়া আসে বিদেশী শাসকের সর্বগ্রাসী শোষণ হইতে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নূতন চেতনা, এক নূতন ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি। ভিন্ন দিক হইতে আর একটা সংগ্রামের ধ্বনি ভারতবর্ষকে কাঁপাইয়া তোলে—

> "গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নূতন করিয়া আরম্ভ হয়; শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ভারতীয় ধনতন্ত্র উহার শিল্প-বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে আর্থনীতিক ও রাজনীতির সুবিধা আদায় করিবার সংকল্প লইয়া অগ্রসর হয়; নবজাত শিল্পসমূহের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী বাহির হইয়া শহরের সহিত গ্রামাঞ্চলের সংযোগ সাধন করে এবং ইংরেজী ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতর আর্থনীতিক বিক্ষোভ উগ্র হইয়া উঠে।"[১]

জাতীয়তাবাদের নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান উপাদান ইতিমধ্যেই ভারতের সমাজের মধ্যে তৈরী হইয়া গিয়াছিল : (১) বিপুল আর্থনীতিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে এবং ভারতের নিজস্ব শিল্প-বিকাশের ঘোরতর বিরোধী রূপে একটা স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক বিদেশী সরকার; (২) ভারতের ক্রমবর্ধমান ধনিকশ্রেণী; এবং (৩) উন্নত ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও আর্থনীতিক কারণে বিশেষ বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়। এই তিনটি উপাদান লইয়াই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। উৎপীড়নকারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশরূপে দেখা দেয় কয়েকখানি নূতন সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রগুলি তীব্র ভাষায় লিখিত তীক্ষ্ণ সমালোচনার কষাঘাতে ভারতের ইংরেজ-সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহাদের সমালোচনা ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণের বর্বররূপ উদঘাটিত করিয়া জনগণের চোখ খুলিয়া দিতে থাকে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ আরম্ভ হয়।

ইংরেজ শাসকগণ এই আক্রমণ এবং মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের বাহনরূপে এই

১। L. Hutchinson : Empire of Nabobs. p. 183.

সংবাদপত্রগুলিকে বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। এই সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "দেশীয় প্রেস-আইন" নামে একটি দমনমূলক আইন পাশ করে। ইহাতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ শাসনের উপর আক্রমণ সমানভাবেই চলিতে থাকে। এই সময় বাঙালাদেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দি বেঙ্গলী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'; মাদ্রাজে 'হিন্দু'; বোম্বাইয়ের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' প্রভৃতি ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি নির্ভীকভাবে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া দিতে থাকে।

এই সকল সংবাদপত্রের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এই সংবাদপত্রগুলির উদ্যোগেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের 'দি বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল "শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।" এই সংগঠনটি সর্বপ্রথম সরকারী কার্যে ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবি লইয়া ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করে এবং ইহার প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষকে ভারতের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করে।

বাঙলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে জাতীয় সংগঠন সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ঐ বৎসর "দেশের সকল শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্য" লইয়া 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া' সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংগঠন 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামক আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হয়।[১] এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটি পর বৎসর ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নিকট "জাতীয় দাবী" হিসাবে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করে : করভার হ্রাস, শিল্প-বিকাশে সরকারী সাহায্য, শিক্ষার প্রসার, শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা, জনস্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠন ইত্যাদি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র, নির্ভীক সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র। ঠিক এই সময়েই বোম্বাই প্রদেশেও জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ভি. এন. মাণ্ডলিক, দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতির নেতত্বে 'বম্বে এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পরেই বাঙালাদেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের উদ্যোগে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ', বোম্বাই

১। Ambika Charan Mazumder : Indian National Evolution, p. 5-6.

প্রদেশের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের উদ্যোগে পুণা শহরে 'সার্বজনিক সভা' এবং মাদ্রাজে 'নেটিভ এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। মাদ্রাজের এই সংগঠনটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মহাজন সভা'র সহিত মিলিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইতে না পারিলেও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে এইগুলির দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল পরবর্তী কালের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।

তৎকালে এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরণের সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধকারে ঘুরিতেছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধের প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিল। এই প্রয়োজনীয়তা-বোধই তাহাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা আরও বাড়াইয়া তোলে। বিদেশী ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন ও শোষণ প্রতিদিন বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের মধ্যে যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলেই এক সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সমগ্র ভারতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" খেতাব গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এক দরবার বসে। কেবল তাহাই নহে, এই সময়েই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা ব্যয়ে কাবুল আক্রমণ করে। তাহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অধিবাসীদের দমনের জন্য সামরিক অভিযান চালাইতে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে এবং ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে ইংলণ্ডের তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া ভারতের নূতন বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে। এই সকল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির তীব্র প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য ইংরেজ শাসকগণ 'দেশীয় সংবাদপত্র আইন' পাশ করে।

ইহার ফলে ভারতবর্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা নিম্নরূপ :

> "এক দিকে একটা পতনোন্মুখ মিথ্যা বাজেটের উপর প্রতিষ্ঠিত বেপরোয়া আমলাতান্ত্রিক সরকার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, এবং অপর দিকে দেশের বিপুল জনসমষ্টি একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে থাকে।"[১]

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের 'ইলবার্ট-বিল' উপলক্ষ করিয়া এই গণ-বিক্ষোভ দেশব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ইংরেজদের ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়নে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় অপমানবোধ জাগ্রত হইবার ফলে তাহাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দাবাগ্নিতে পরিণত হয়।

১। A. C Mazumder : Evolution of Indian National Congress. p. 28-29.

করে তবে তাহারা বড়লাটের বাড়ীর পাহারাদার সিপাহীদের পরাজিত করিয়া বড়লাটকে (লর্ড রিপনকে) চাঁদপাল ঘাট হইতে স্টীমারে চাপাইয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা (বাংলার) লেফ্‌টনান্ট গভর্নরের অজ্ঞাত ছিল না।"[১]

'ইলবার্ট-বিল'-এর বিরুদ্ধে সারা ভারতের শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠী ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের আন্দোলনে ভারত-সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতীয়দের দিক হইতে এই বিলের স্বপক্ষে কোন জোর প্রচার ও আন্দোলন হইল না। ইংরেজ শাসকগণের বিচার-সংক্রান্ত এই বৈষম্য ভারতীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলেও সেই বিক্ষোভ এতদিন কোন সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে নাই। ইহার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এতদিন ভারতীয়দের বিভিন্ন অধিকারের কথা বলিলেও এই সংগঠন এ পর্যন্ত এই প্রকারের কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাই। এইবার 'ইলবার্ট-বিল' উপলক্ষে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতা ও উহার ভয়ংকর রূপ দেখিয়া 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর নেতৃবৃন্দ ভয়ে পশ্চাৎপদ হন। শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠীর বাধার বিরুদ্ধে ও বিলের স্বপক্ষে তাঁহারা কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাদের এই অক্ষমতা দেশের জাগ্রত যুবশক্তির নিকট 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর দুর্বলতা ও ভীরুতা স্পষ্ট করিয়া তোলে। এই আন্দোলনের ফলে ভারত-সরকার শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতার নিকট মাথা নত করিয়া বিলটি তুলিয়া লয়।

'ইলবার্ট-বিল'-এর পরাজয়ের ফলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন জাতীয় অপমানের গ্লানিতে ভরিয়া যায়। বিজয়ী শাসক-জাতি বলিয়া শ্বেতাঙ্গদের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাহাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। 'ইলবার্ট-বিল'-এর পরাজয়কে তাহারা চরম জাতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ করে। সরকারী ইতিহাস-প্রণেতা বাক্‌ল্যাণ্ডও তাঁহার গ্রন্থে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন : " 'ইলবার্ট-বিল'-এর শিক্ষা কোন ভারতবাসীই কোন দিন ভোলে নাই।"[২] তাহারা ইহাও উপলব্ধি করে যে, ভারতবাসীরা যতদিন নিজেদের শক্তিদ্বারা তাহাদের দাবি পূর্ণ করিতে না পারিবে, তাহারা যতদিন শাসকদের সদাশয়তার উপর নির্ভর করিবে, ততদিন তাহাদের পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখ-দুর্দশার অবসান তো দূরের কথা, বরং তাহা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিবে। এই জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁহাদের মধ্যে এক দুর্জয় বিদ্রোহী মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠিতে থাকে।

১। C. E Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol. II, p. 787.
২। C. E. Buckland : Bengal under Lieut. Governors, Vol, II. p. 789.

কংগ্রেসের জন্ম

দেশব্যাপী একটা প্রবল বিক্ষোভ ও সংগ্রামের মধ্য হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হয়। ইহার পূর্ব হইতেই দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে একটা বিরাট সংগ্রামের আলোড়ন দেখা দিতেছিল, বিশেষত কৃষক জনসাধারণের মধ্যে এই বিক্ষোভ ও সংগ্রামের প্রস্তুতির লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এতদিন তাহাদের সংগ্রাম চলিত বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতভাবে, এবার তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্নর বড়লাটের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে লিখিয়া পাঠান :

> "পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে রায়তদের মধ্যে লীগ ও য়ুনিয়ন গঠনের মনোভাব দেখা যাইতেছে। এই সকল সংঘের উদ্দেশ্য বহু প্রকারের হইতে পারে। এই উপায়ে তাহারা যদি কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সকল সময়েই একটা আশঙ্কা থাকিবে যে, হয়ত চাষীরা পরে খাজনা বন্ধের জন্যও সংঘবদ্ধ হইবে এবং তাহা হইলে জমিদারগণও বলপ্রয়োগে খাজনা আদায় করিতে পারে। বাঙলাদেশের বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠন সৃষ্টির পরিণাম ভয়াবহ হইবে। এই অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।"[১]

তখন ইহা কেবল বাঙলাদেশেরই অবস্থা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-জনগণের মধ্যেই এই নূতন সংগ্রামী মনোভাব দেখা যায়। তখন মালাবার উপকূলের মোপলা-চাষীরা বারবার বিদ্রোহ করিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; বোম্বাই প্রদেশের মারাঠা-চাষীরা এক ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল; দাক্ষিণাত্যের চাষীরা এক বিরাট বিদ্রোহের দ্বারা 'মহাজনী-আইন' পাশ করিতে শাসকদের বাধ্য করিয়াছিল; উত্তর-বঙ্গের চাষীদের বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট' পাশ হইয়াছিল এবং অযোধ্যা ও পাঞ্জাব-প্রদেশেও কৃষক-সংগ্রামের ফলে শাসকগণ পুরাতন কৃষি-আইনের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ করিতেছিল।

ঠিক এই সময় ভারতের নবজাত শিল্পের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন সংগ্রামী শক্তিরূপে দেখা দেয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্প-কেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট হয়। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট করিয়া শ্রমিকগণ তাহাদের দাবি আদায় করিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে "মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন" নামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১। C. E. Buckland : Bengal under Lieut. Governors. Vol. I. p. 544

ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের, বিশেষ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে ভারত-সরকারের দ্বারা ক্রমাগতভাবে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পের বিকাশে বাধাদানের ফলে দেশীয় মালিকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া উঠে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তূলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে সকল প্রকার আমদানি-শুল্ক তুলিয়া দেওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রের প্রতিযোগিতার মুখে দেশিয় বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এবার ভারতীয় মালিকদের পক্ষে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্দশা ও জাতীয় অপমানের গ্লানি তাহাদেরও সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য করে।

> "ইহা প্রতিদিনই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভারতের পরাধীন অবস্থা ভারতবাসীর মনে কেবল একটা গভীর ক্ষতই সৃষ্টি করে নাই, ইহা ভারতীয় মালিকদের পকেটও স্পর্শ করিতেছে। আত্মমর্যাদা এবং আত্মস্বার্থ সমানভাবেই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। স্বভাবতই মালিকদের নেতৃত্বে...একটা জাতীয় আন্দোলন এবার দেখা দিতে পারে। সুতরাং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম ছিল একটা স্বাভাবিক ঘটনা।"[১]

'ইলবার্ট-বিল'-এর ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে 'ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন'-এর ব্যর্থতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ এই বিলের ব্যর্থতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মন লৌহশলাকার মত বিদ্ধ করিতেছিল। ইহার ফলে আরও শক্তিশালী একটা রাজনীতিক আন্দোলন এবং 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' অপেক্ষা শক্তিশালী একটা প্রকৃত জাতীয় সংগঠনের আবশ্যকতা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই ভারতীয়দের পক্ষ হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছিল। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল ভারতীয়দের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত স্বরূপ।

প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'ব্রাহ্ম সমাজ'। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'। এই সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল "সকল শ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গল সাধন এবং সকলের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা।" ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটি 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর সহিত মিলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্রযোগে বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট বহু প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ভারতের জনপ্রতিনিধিদের লইয়া আইনসভা গঠনের দাবি জানায়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'ই ছিল ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের

১। Hirendra Nath Mukherjee : India Struggles for Freedom. p. 64.

শাখা-প্রশাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর কলিকাতা শাখা সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি এই সম্মেলনকে 'ভারতের জাতীয় পার্লামেণ্ট' আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

এইভাবে দেখা যায়, সরকারী উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভের বহু পূর্বেই ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীও নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইয়াছিল। তাহাদের সাফল্য যখন আসন্ন হইয়া উঠে তখনই বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হিউম সেই ষড়যন্ত্রের মারফত ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগকে সাময়িকভাবে সরকারী প্রভাবে আনয়ন করিয়া নিজের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিতে সক্ষম হন। রজনী পাম দত্তের কথায় :

> "প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে এবং বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির পুঞ্জীভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছিল।
>
> "বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লবকে (কৃষক-বিদ্রোহকে—লেঃ) পরাজিত করা, অথবা আরম্ভের পূর্বেই উহা ব্যর্থ করা।"[১]

সাধারণভাবে এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা হয়। 'সিভিলিয়ান' হিউম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পরেই ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকিতেই হিউম গোপনে প্রাপ্ত পুলিশ রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এক গভীর বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আসন্ন এবং চারদিকে গোপন বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকটি ছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কাল। একদিকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, অপরদিকে ইংলণ্ডের রানীকে "ভারতেশ্বরী" বলিয়া ঘোষণা উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে

১। R. P. Dutt : Ibid, p. 289-90.

অজস্র অর্থব্যয়ে এক দরবারের আয়োজন চলিতেছিল। ইহার ফলে জনসাধারণের বিক্ষোভ শতগুণ বাড়িয়া যায়। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে থাকে। ভারত সরকার ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদপত্র-আইন' পাশ করিয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করে, অস্ত্র-আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে সকল প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে এবং সভাসমিতি বন্ধ করিয়া গণবিক্ষোভ দমনের প্রয়াস পায়। ইহারই পরিপূরক হিসাবে এবং গণ-বিদ্রোহের সংকট হইতে ভারতের ইংরেজ শাসনকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিউমের জীবনীকার স্যার উইলিয়াম ওয়েডরবার্ন লিখিয়াছেন :

"এই সকল অবিবেচনা-প্রসূত সরকারী ব্যবস্থা ও তৎসহ রুশিয়ার অনুরূপ পুলিসী দমননীতির ফলে বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনাধীন ভারতবর্ষ এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ হিউম ও তাঁহার ভারতীয় পরামর্শদাতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া কার্যে অবতীর্ন হন।"[১]

ওয়েডারবার্ন হিউমের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন :

"বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালের শেষভাগে, অর্থাৎ ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউম সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং বুদ্ধিজীবীদের বিরূপ মনোভাবের ফলস্বরূপ যে ভয়ঙ্কর বিপদ ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও ইংরেজ শাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে হিউম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সতর্কতা-জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়াছিলেন।"[২]

হিউম তাঁহার কার্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন :

"সেই সময়, এমনকি এখনও, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বা নাই যে, আমরা সেই সময় একটা ভয়ঙ্কর গণ-বিপ্লবের ঘোরতর বিপদের মধ্যে ছিলাম।

"বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি বিরাট 'ফাইল' আমাকে দেখানো হইয়াছিল।...রিপোর্ট ও সংবাদগুলি বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। রিপোর্ট ও সংবাদগুলির সংখ্যা অতি বিপুল। এইগুলি ত্রিশ সহস্রাধিক সংবাদদাতার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। বহু রিপোর্টে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আলোচনার সংবাদ ছিল। এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, 'এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক-কৃষক, নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের অনাহারে মৃত্যু

১। Sir William Wedderburn . Allan Octavian Hume. Father of Indian National Congress. p. 101.

২। W. Wedderburn : Ibid. p. 50.

অনিবার্য; মরিবার পূর্বে একটা কিছু করিবার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একটা কিছু করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দলবদ্ধ হইতেছে। এই একটা কিছুর অর্থ হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ।' বহু পুলিশ-বিবরণীতে পুরাতন তরবারি, বল্লম ও গাদাবন্দুক লুকাইয়া রাখিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। ইহা কেহ ভাবে নাই যে, ইহার ফলে প্রথম স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিবে, অথবা বিদ্রোহ বলিতে যাহা বুঝায় সেই প্রকারের কিছু ঘটিবে। আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, আকস্মিকভাবে চারিদিকে ইতস্তত হিংসামূলক অপরাধ, দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, বাজার লুট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের নীচু স্তরের অর্ধাহারী শ্রেণীসমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জলবিন্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বৃহৎ দলে পরিণত হইবে; দেশের সকল দুষ্টলোক একত্র হইলে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ্ডাদলগুলি একত্র হইবার পর,...সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে ঐ দলগুলিতে যোগদান করিবে; তাহারা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবে এবং উহাকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে পরিচালিত করিবে।"[১]

এই সকল বিপদ-সূচক সংবাদ প্রাপ্তির পর বৃটিশ সরকার একদিকে প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করে এবং অপরদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচনা করিতে থাকে। এইভাবে দমননীতি প্রয়োগের পর বৃটিশ সরকার যখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আর সম্ভাবনা নাই, কেবল তখনই জনসাধারণের গণ-বিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ ও বৈধপথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য অবসরপ্রাপ্ত 'সিভিলিয়ান' অক্টাভিয়ান হিউম বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হিউম সিমলায় গিয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

"ভারতের বৃটিশ শাসনের কেন্দ্রস্থল সিমলায় বসিয়াই বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন ও হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচিত হয়।"[২]

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. বোনার্জি মহাশয়ও এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া লিখিয়াছেন :

"সম্ভবত ইহা বহুলোকের নিকটেই একটি সংবাদ যে, যেভাবে প্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে যেভাবে তাহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের বড়লাট হিসাবে ডাফ্‌রিন ও আভার মার্কুইস্-এরই (বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন—লেঃ) কীর্তি।"[৩]

১। W. Wedderburn : Ibid. p. 80-81.

২। R. P. Dutt : India Today. p. 293.

৩। W. C. Bonerjee : Introduction to Indian Politics (Article. 1898).

দেশব্যাপী একটা ভয়ঙ্কর কৃষক-বিদ্রোহের "বিপদ" হইতে ভারতের বৃটিশ শাসনকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবেই যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :

> "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের বৎসরগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। বৃটিশ শাসকদের মধ্যে হিউমই ছিলেন একমাত্র বক্তি যিনি একটা বিপর্যয় আসন্ন বলিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাতে বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন।...অবস্থা কতখানি বিপজ্জনক হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়াবার জন্য তিনি সিমলায় উপস্থিত হন। সম্ভবত তাঁহার এই সাক্ষাতের ফলেই চমৎকার কাজের লোক নূতন ভাইস্রয় (লর্ড ডাফ্‌রিন) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রসর হইতে হিউমকে উৎসাহিত করেন। এই সময়টা ছিল এই সর্বভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কৃষক-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলেই তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিত। সেই কৃষক-বিদ্রোহের পরিবর্তে এই সর্বভারতীয় আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য একটা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিল। সেই জাতীয় আন্দোলন হইতেই নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। ইহার পরিণতি শেষ পর্যন্ত খুবই ভাল হইল এই কারণে যে, একটা হিংসামূলক ঘটনা আবার ঘটিতে দেওয়া হয় নাই।"[১]

কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হিউম লিখিয়াছেন :

> "আমাদের শাসনের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ একটা ক্রমবর্ধমান বিরাট শক্তির আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একটা রক্ষা-কবচের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ কোন কৌশল উদ্ভাবন করা সেই সময় সম্ভব ছিল না।"[২]

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকে নাই। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ. সি. বোনার্জি। হিউম সাহেব নিজেই নিজেকে কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া কার্য পরিচালনা করেন। এই অধিবেশনের প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য-সমাজের সদস্য। তাহারা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সম্পর্কে অনুসৃত সরকারী নীতির সমালোচনা করিলেও কোন ক্রমেই ইংরেজ-বিরোধী, এমনি সরকার-বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেস সম্পর্কে যাহাতে শাসকদের মনে কোন প্রকারের ভুল ধারণা সৃষ্টি না হইতে পারে তাহার জন্য সভাপতির চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ভাষণে কংগ্রেসের

১। C. F. Andrews & Girija Mukherjee : Rise and Growth of the Congress in India, p. 128-29.

২। Quoted from Wedderburn's Allan Octavian Hume etc. : Ibid. p. 77.

উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বলেন :

"আমাদের প্রিয় লর্ড রিপনের স্মরণীয় শাসনকালে জাতীয় ঐক্যের যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশ ও সংহতি সাধনই"[১] কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অধিবেশনের প্রতিনিধিদের "একমাত্র জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে ব্যাপক ভিত্তিতে সরকার গঠিত হইবে এবং তাহাতে ভারতের জনগণ উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে,"[২] অর্থাৎ ভারত-সরকারের আইনসভায় দেশের কয়েক-জন নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের অনুরোধই ছিল প্রধান জাতীয় দাবি। সংক্ষেপে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে মূল কথাটি ঘোষণা করা হয় তাহা এই : "ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি।"[৩]

ইংরেজ শাসনের প্রতি কংগ্রেস অনুগত থাকিবে—এই মনে করিয়া ভারত-সরকার প্রথমেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেয়। শাসকগণ মনে করিয়াছিল যে, হিউম ও ভারতের "সম্ভ্রান্তবংশীয়" নেতৃবৃন্দ বর্তমান থাকিতে ইহা ইংরেজ ও সরকার-বিরোধী হইবে না। বড়লার্ট লর্ড ডাফ্‌রিন পূর্বেই কংগ্রেসকে "আশীর্বাদ" জানাইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি চাহিয়াছিলেন "চরমপন্থী" বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে "নরমপন্থী"দের লইয়া একটা দুর্গরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিতে। এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বুঝিয়া ইংরেজ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। প্রকৃতপক্ষে তখনই তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। বাঙলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বোম্বাইয়ের গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজশা মেটা, মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্যম আয়ার ও দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক মতামত ছিল ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর উদারনীতিক দলেই অনুরূপ। তাঁহারা "চরমপন্থা" ও বৃটিশ-বিরোধিতার পথ প্রাণপণে পরিহার করিয়াই চলিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসকগণের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়া আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কিছু রাজনীতিক সুবিধা আদায় করাই ছিল তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেই সময়ের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কংগ্রেসকেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া বরণ করিয়া লয়। প্রথম অধিবেশন হইতে দেশবাসীর নিকট যে ক্ষীণ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই দেশের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, উকিল প্রভৃতি শিক্ষিত-শ্রেণীর মধ্যে এক বিপুল সাড়া জাগাইয়া তোলে, সেই আহ্বানকেই তাহারা জাতীয় আহ্বান বলিয়া গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি কংগ্রেস-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা এরূপভাবে বৃদ্ধি পায়

১। Ambika Ch. Mozumdar : 'Indian National Evolution' p. 271.
২। R. P. Dutt : India Today. p. 268.
৩। Ambika Ch. Mozumdar : Indian National Evolution. p. 274.

যে, নেতৃবৃন্দ ভীত হইয়া প্রতিনিধি-সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল মাত্র বাহাত্তর জন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় চারিশত চৌত্রিশ, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ-অধিবেশনে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়শত সাত। চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশন হয় এলাহাবাদ ও বোম্বাই নগরীতে, আর এই দুই অধিবেশনের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,২৪৮ ও ১,৮৮৯ জন।

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ—এই তিনটি অধিবেশন কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্থির হইবার পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সমগ্র ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের জন্য ইংলণ্ডেও একটি কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয়। এক সময় এই কমিটিতে বৃটিশ পার্লামেণ্টের দুই শত সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় আয়ার্লণ্ডে 'হোমরুল'-এর দাবি লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্যগণ ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিতে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ভারতেও প্রত্যেক প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয়। সেই সকল প্রাদেশিক ও জেলা-কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইতে থাকে। এইভাবে "উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয়" প্রতিনিধিদের গণ্ডির মধ্যে কংগ্রেসকে আবদ্ধ রাখিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেস শীঘ্রই একটি সর্ব-ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

* * *

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সর্বশক্তি দিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। সে দিনের মত আজিও কংগ্রেস ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষি-বিপ্লবের প্রধান শত্রুরূপে সক্রিয়। উপরোক্ত তথ্যসমূহ হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধ শক্তিরূপে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা নির্ধারণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নিজস্ব অবদান নহে, কংগ্রেসের এই বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা প্রথম হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছিল। গান্ধী কেবল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত সেই নীতি কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতের বৃটিশ শাসন এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসাবেই হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিউমের উদ্দেশ্যের অনুরূপভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাকে গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ রূপে গড়িয়া তোলা ও পরিচালিত করা হইলেও অন্য কোন গণ-সংগঠনের অভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতের জনসাধারণ ইহাকেই নিজস্ব সংগঠনরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং ইহাতে অগণিত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে নিজ নিজ শ্রেণীর মুক্তিলাভের এবং জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিবার ও পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

তাই দেখা যায়, অল্পকাল পরেই বৃটিশ শাসকগণ এই প্রতিষ্ঠাটিকে "রাজদ্রোহের কেন্দ্র" মনে করিয়া ইহার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। অপরদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বও শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সর্বশক্তি দিয়া বাধাদান করিয়া আসিয়াছে। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়া প্রত্যেকটি সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের যোগদানে বাধা দিয়া এবং শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া বুর্জোয়া ও জমিদারগোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি দেশের আশিভাগ সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র মূলধনী ও জমিদারগোষ্ঠীর জন্য রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সুবিধা আদায়—ইহাই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যই কংগ্রেস-নেতৃত্বে পরবর্তীকালে দ্বৈত ভূমিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। **প্রথমত,** বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হস্ত হইতে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সুবিধা আদায়ের যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বকে ভূমিকা অবলম্বন করিতে এবং জাতির প্রতিনিধিরূপে কয়েকবার জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। **দ্বিতীয়ত,** জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সেই নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস-নেতৃত্বকে বারংবার ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই সহযোগিতার অপরিহার্য শর্ত হিসাবেই শ্রমিক-কৃষক গণশক্তিকে নিজস্ব বৈপ্লবিক পন্থায় জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে বারংবার অর্ধপথে জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। শাসকগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ, অর্ধপথে উহা প্রত্যাহার এবং শাসকগোষ্ঠীর দিকে আপসের হস্ত প্রসারণ—ইহাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি।

"আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের এই দ্বৈত চরিত্র প্রথম যুগের গোখেল হইতে পরবর্তীকালে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য গান্ধী পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় (এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল দুই যুগের গণ-আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এবং তাহার পরিণতি স্বরূপ প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের)। কংগ্রেসের এই দ্বৈত ভূমিকা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত ভূমিকারই ছায়ামাত্র, অর্থাৎ একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিরোধ ও ভারতীয় জনসাধারণকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমানচিত্ততা এবং অপরদিকে 'অতি দ্রুত' অগ্রগতির ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষে লব্ধ বিভিন্ন সুবিধা-সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে উহার (ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর —লেঃ) নিজস্ব সুবিধা-সুযোগেরও অবসান ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে জোয়ার দেখা দেয়, তাহার মধ্যেই কংগ্রেস নেতৃত্বের এই দ্বৈত ভূমিকার দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। সেই সময় কংগ্রেস নেতৃত্ব 'মাউন্টব্যাটেন এ্যায়োয়ার্ড'-এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তান 'ডোমিনিয়ন' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাকেই সাম্রাজ্যবাদের সহিত 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তি' বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় হইতেই জাতীয় কংগ্রেস হইল ভারত ডোমিনিয়নের (পরে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের—লেঃ) সরকারী দল। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করিতে থাকে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এই শেষ পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের প্রধান সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রামের আরম্ভ ও পলায়ন, আবার অগ্রসর হইয়া সাম্রাজ্যবাদকে দ্বন্দ্বে আহ্বান এবং পুনরায় আপস—ইহাই ছিল দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র পথ।"[১]

১। R. P. Dutt : India Today, p. 296-97.

নির্ঘণ্ট

ঊ

নির্ঘণ্ট



মহাবিদ্রোহের সংবিধান

[মূল সংবিধান উর্দুতে লেখা (উপরের ছবি)। দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভে রক্ষিত। ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে 'ফ্রিডম স্ট্রাগল ইন উত্তরপ্রদেশ' গ্রন্থে (সম্পাদনা এস.এ.এ. রিজভি, এম. এল. ভার্গব/খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ৪১৯-২১)।

ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ : তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :

অনুবাদ সহযোগিতা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুখেন্দু নারায়ণ ঘোষ]

পৌর প্রশাসন

দিল্লী

রাষ্ট্রীয়-সভা

সবচেয়ে দয়ালু ঈশ্বরের নামে

সামরিক ও পৌর প্রশাসনের বিশৃঙ্খলা অপসারণ করতে এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে একটা 'সংবিধান' রচনা করা হল—যার জরুরী বিধিগুলো নিম্নোক্ত :

১. বিচার বিভাগের জন্য একটা 'শাসন-পরিষদ' গঠন করা হবে [উর্দুতে যার নাম 'জলসা-ই-ইন্তিজাম-ই-ফৌজি-ওয়া-মুল্‌কি।]।

২. দশজন সদস্যকে এই পরিষদে নিযুক্ত (নির্বাচিত) করা হবে—৬ জন সামরিক বাহিনী থেকে এবং ৪-জন অসামরিক জনগণের মধ্যে থেকে। (পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রতিটার থেকে ২-জন করে নিয়ে মোট ৬-জন সামরিক বাহিনীর সদস্য।)

৩. এই দশজনের মধ্যে একজন সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হবে। সভাপতির দুটি ভোট থাকবে। প্রয়োজন

অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হবে। পাঁচজন উপস্থিত হলে সভা-সিদ্ধ (Quorum) হবে।

৪. কার্যভার গ্রহণের সময় প্রত্যেককে নিম্নোক্ত শপথ বাক্য পাঠ করতে হবে : আমি আমার কর্তব্য সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করবো; কোন স্বজনপোষণ করবো না; কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে সুচিন্তিতভাবে কাজ করবো; শাসনের সূক্ষ্মতম অনুপুঙ্খকেও বাদ দেব না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কোন অত্যাচার, বলপ্রয়োগ বা পক্ষপাতিত্ব করবো না। এমনভাবে শাসন চালাবার চেষ্টা করবো যাতে সরকারের সংহতি এবং প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিষদ বা সাহিব-ই-আলমের অনুমতি ব্যতিরেকে পরিষদের সিদ্ধান্ত আগে থেকে কারো কাছে প্রকাশ করব না।

৫. পরিষদের নির্বাচন এভাবে হবে :
সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রত্যেকটির থেকে ২-জন করে। তাঁরা হবে কাজে জ্যেষ্ঠ (senior), যোগ্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, উপযুক্ত ও বিচক্ষণ। তবে কেউ যদি যোগ্য, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং পরিষদে কাজ করতে সক্ষম হন অথচ কর্মজীবনে বয়োজ্যেষ্ঠ নন—তাহলে শুধুমাত্র এই কারণে পরিষদের নির্বাচনের অনুপযুক্ত বলে সে বিবেচিত হবে না। অন্য ৪-জন অ-সামরিক সদস্যও এভাবেই নিযুক্ত বা নির্বাচিত হবে।

৬. এই নিযুক্তির পর যদি ১০-জনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ সভায় কেউ এমন মত প্রকাশ করে যার পিছনে আন্তরিকতার অভাব, অসততা ও স্বজনপোষণ দেখা যায়—তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আর পঞ্চম ধারা অনুযায়ী তার পরিবর্তে আর একজনকে নির্বাচিত করা হবে।

৭. সমস্ত শাসনতান্ত্রিক বিষয়ই পরিষদে সিদ্ধান্তের জন্য অবগত করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সহমতের জন্য সাহিব-ই-আলম বাহাদুরের নিকট পেশ করতে হবে, পরিষদ এর অধীন। ঐক্যমতের পর সিদ্ধান্তগুলো অবগতির জন্য বাদশাহকে পাঠানো হবে। সামরিক অ-সামরিক কোন সিদ্ধান্তই পরিষদ, সাহিব-ই-আলম এবং বাদশাহর সহমত ছাড়া কার্যকর হবে না। সাহিব-ই-আলম পরিষদের সঙ্গে সহমত না হলে পুনর্বিবেচনার জন্য আবার পাঠানো হবে। তা সত্ত্বেও দুইয়ের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে সিদ্ধান্তটি বাদশাহর কাছে যাবে, যাঁর নির্দেশ চূড়ান্ত।

৮. পরিষদের সভায় সাহিব-ই-আলম বাহাদুরের এবং বাদশাহের সদস্য ছাড়া আর কেউ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবে না। যদি পরিষদের কোন সদস্য

জোরদার যথার্থ কারণে সভায় অনুপস্থিত হয়; বাকী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের যে সিদ্ধান্ত হবে, তাই পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হবে।

৯. কোন সদস্য পরিষদে কোন প্রস্তাব আনতে চাইলে আর একজন সদস্যর সমর্থন লাগবে এবং দুজনের মতৈক্যে প্রস্তাব দেওয়া যাবে।

১০. ৯-নং ধারা অনুযায়ী কোন প্রস্তাব পরিষদে আনার সময় প্রস্তাবকক্ষে প্রথমে একটা ভাষণ দিতে হবে, তার ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বাধা দেওয়া চলবে না। কেউ কোন বিরোধী বক্তব্য জানালে, সেক্ষেত্রেও এটা করতে হবে। কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ বিরোধী মতের বিরুদ্ধে বললে এবং পরিষদের অন্যরা নীরব থাকলে, প্রতিটি সদস্য তার মতামত লিখে রাখবে। বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠর ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হলে, প্রতিটি বিভাগের সম্পাদককে জানিয়ে দেওয়া হবে।

১১. ২-নং ধারায় যেমন বলা আছে, সেই অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের নির্বাচিত সদস্যরা প্রতিটি সামরিক বিভাগের প্রশাসক হিসাবে কাজ করবেন।

৪-নং ধারা অনুসারে, তাদের অধীনে চার সদস্যের একটি কমিটি থাকবে। প্রয়োজন মতো কমিটির সম্পাদকও নিযুক্ত হবে। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠর মতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা পরিষদের সামনে রাখা হবে এবং ৭-নম্বর ধারা অনুযায়ী কাজ করবে।

এই পদ্ধতি সমস্ত সামরিক এবং অ-সামরিক বিভাগে অনুসৃত হবে।

১২. সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে, যে কোন সময় পরিষদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থাকবে।

মহাবিদ্রোহের কালপঞ্জী

১৮৫৭

জানুয়ারি	—	দমদম চর্বিযুক্ত কার্তুজ নিয়ে সিপাহীদের অসন্তোষ ধূমায়িত।	(বাংলা)
ফেব্রুয়ারি	—	ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে বিদ্রোহ।	(বাংলা)
মার্চ	—	ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনা।	
এপ্রিল	—	আম্বালা অশান্ত, অগ্নিগর্ভ।	(পাঞ্জাব)
		লক্ষ্ণৌতে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিতে বিদ্রোহ।	(উত্তরপ্রদেশ)
		মিরাটে তৃতীয় লাইট ক্যাভেলরিতে গুলি-গোলা।	(উত্তরপ্রদেশ)
মে	১০	মিরাটে যুদ্ধ এবং হত্যা।	(„)
	১১	দিল্লীতে ইউরোপীয়ানদের হত্যা।	(দিল্লী)
	২৩	আগ্রায় আতঙ্ক।	(উত্তরপ্রদেশ)
	৩০	মথুরাতে বিদ্রোহ।	(„)
		লক্ষ্ণৌতে সেনাবিদ্রোহ।	(„)
	৩১	ভরতপুরে সেনাবিদ্রোহ।	(হরিয়ানা)
জুন	৫	কানপুরে দ্বিতীয় ক্যাভেলরিতে বিদ্রোহ।	(উত্তরপ্রদেশ)
	৬	কানপুর বিদ্রোহীদের দখলে।	(„)
		এলাহাবাদে ষষ্ঠ নেটিভ ইনফ্যানন্ট্রিতে বিদ্রোহ।	(„)
	৭	আলিপুরে বৃটিশ সেনাবাহিনীর দায়িত্বে এলেন উইলসন এবং বার্নার্ড।	(বাংলা)
	৮	বাদলি-কি-সরাই-এর যুদ্ধ।	(উত্তরপ্রদেশ)
		ঝাঁসিতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বিদ্রোহীদের।	(„)
	১১	লক্ষ্ণৌতে পুলিশ বিদ্রোহ।	(„)
		এলাহাবাদে নেইল হাজির।	(„)
	২৫	কানপুরে নানাসাহের শর্ত দিলেন হুইলারকে।	(„)
	২৭	কানপুরের সতীচৌরা ঘাটে ইংরেজ-হত্যা।	(„)
	৩০	চিনহাটের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি।	(উত্তরপ্রদেশ)
		লক্ষ্ণৌ-প্রাসাদ ঘেরাও।	(„)
জুলাই	১	ইণ্ডোরে বিদ্রোহ।	(মধ্যপ্রদেশ)
	২	দিল্লীতে বেরেলির সৈন্য নিয়ে ভকত খাঁর প্রবেশ।	(দিল্লী)
	৪	লক্ষ্ণৌর যুদ্ধে স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু।	(U.P)
	৫	জেনারেল বার্নাডের মৃত্যু।	
	৭	কানপুর যাত্রার জন্য হ্যাভলকের বাহিনীর এলাহাবাদ ত্যাগ।	
	১৬	কানপুরের প্রথম যুদ্ধে নানাসাহেবের পরাজয়।	(U.P)
	২৭	আরা অবরোধ শুরু।	(বিহার)
	২৯	উনাও জয় হ্যাভলকের।	(বিহার)
আগস্ট	৫	বসিরাটগঞ্জে হ্যাভলকের কাছে বিদ্রোহীরা পরাজিত।	(U.P)
	১৩	হ্যাভলকের সৈন্যর কানপুর থেকে পলায়ন	(U.P)

আগস্ট	১৪	দিল্লীর প্রান্তে জন নিকলসনের চলমান সৈন্যের আগমন। (দিল্লী)	
	১৬	বিথুরে বিদ্রোহীরা হ্যাভলকের বাহিনীর কাছে পরাস্ত।	(U.P)
১৮৫৭			
সেপ্টেম্বর	৫	কানপুরে স্যার আউটরামের পদার্পণ।	(U.P)
	১৪	ব্রিটিশদের দিল্লী আক্রমণ।	
	১৯	লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে হ্যাভলক ও আউটরামের যাত্রা।	(U.P)
	২০	অবশেষে বিদ্রোহীদের শক্তঘাঁটি দিল্লী দখল।	
	২১	সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর ইংরেজ সেনাপতি উইলিয়ম হডসনের হাতে বন্দী।	
	২২	হডসন মোঘল রাজপুত্রদের খুন করল।	
অক্টোবর	১০	আগ্রায় বিদ্রোহীরা পরাস্ত। লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহীদের দখলে।	(U.P)
নভেম্বর	৯	লক্ষ্ণৌ থেকে কাভানাখের পলায়ন।	
	১৯	ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের লক্ষ্ণৌ ত্যাগ।	
	২২-২৩	লক্ষ্ণৌ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার।	
	২৪	হ্যাভলকের মৃত্যু।	
	২৮	কানপুরের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ উইনধাম পরাস্ত।	
ডিসেম্বর	৬	কানপুরের তৃতীয় যুদ্ধে ক্যাম্পবেলের কাছে তাঁতিয়া তোপী পরাস্ত।	
১৮৫৮			
জানুয়ারি	৬	ফতেগড় পুনর্দখল ক্যাম্পবেলের।	(U.P)
মার্চ	২	ক্যাম্পবেলের লক্ষ্ণৌ অভিযান।	
	২১	লক্ষ্ণৌ ইংরেজের দখলে। স্যার হিউজ রোজ ঝাঁসিতে উপস্থিত।	(U.P)
এপ্রিল	৩	ঝাঁসি ইংরেজের দখলে—অবাধ লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যালীলা।	
	১৫	রুইয়াতে ওয়ালপোল (ইংরেজ সেনাপতি) পরাজিত।	(M.P)
	২৩	কালপিতে সসৈন্যে রোজের প্রবেশ।	(M.P)
মে	৫	বেরেলির বাইরে ক্যাম্পবেল খান বাহাদুর খাঁকে পরাজিত করে।	(U.P)
জুন	১৭	কোটা-কি-সরাই-এর যুদ্ধ—যুদ্ধে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যু।	(U.P)
	১৯	গোয়ালিয়রের যুদ্ধ।	(M.P)
নভেম্বর	১	এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা বৃটিশ সরকার ভারতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'র পরিবর্তে সরাসরি ইংরেজ সরকারের শাসন জারি।	
১৮৫৯			
মার্চ	২৯	দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে দোষি সাব্যস্ত করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হল স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র সহ।	
এপ্রিল	১৮	মহাবিদ্রোহের মহাসেনানী তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি।	

গ্রন্থসূত্র : The Great Munity : India 1857 by Christopher Hibbert.

পরিশিষ্ট - ৩

জাতিয় লজ্জা

মহাবিদ্রোহ আজ, এই বিদ্রোহের দেড়শ' বছরে আমাদের শাসক শ্রেণী ও কর্তাদের কাছে কিভাবে আছে তার প্রমাণ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর একটি খবর। মহাবিদ্রোহ হিন্দু-মুসলমান সংহতির ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক সংগ্রামের উজ্জ্বল বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত যার তুলনা আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে প্রায় নেই। সেই বিদ্রোহের পক্ষে এ ব্রিটিশ সেনাদের নির্লজ্জ দমনোৎসবের বিরুদ্ধে যারা এখনও সব থেকে বেশি সরব, তারা আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকৃতির প্রবক্তা। মহাবিদ্রোহের উত্তরাধিকার এভাবেই কি প্রভাবিত হবে? বৃটিশদের ঔপনিবেশিক লজ্জাহীন আচরণের প্রতিবাদ কি ধ্বনিত হবে না মহাবিদ্রোহের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের কণ্ঠে কর্মে? খবরটা নিচে দেওয়া হল —

সংবাদ প্রতিদিন

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ রবিবার ৫ আশ্বিন ১৪১৪

সিপাহি বিদ্রোহের মিরাটে ব্রিটিশ সেনাদের সাড়ম্বরে দমনোৎসব

মিরাট, ২২ সেপ্টেম্বর : সিপাহি বিদ্রোহের জন্মভূমিতেই কি না সিপাহি বিদ্রোহের অপমান!

১৮৫৭ সালে মিরাটের যে মাটিতে রোপিত হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের বীজ, সেখানেই উদ্‌যাপিত হয়ে গেল বিদ্রোহ-দমনের বিজয়োৎসব! সম্প্রতি, ১৯ জন ব্রিটিশ এসেছিলেন ভারত সফরে। সেই দলটিতে ছিলেন ব্রিটিশবাজের কয়েকজন প্রবীণ সেনানীও। মিরাটে এসে মহাসমারোহে বিদ্রোহ-দমনের বিজয়োৎসব পালন করেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, ১৫০ বছর আগে মিরাটের যে ময়দানে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, তার কাছেই সেন্ট জনের গির্জার কাছে একটি বিজয়ফলকও প্রোথিত করে এসেছেন তাঁরা। আর, এই নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। প্রতিবাদ উঠেছে রাজনৈতিক মহল থেকেও। বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, ব্রিটিশদের ওই দলটিকে লখনউয়ে ঢুকতে দেওয়া হলে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু করবে তারা।

বিজেপি-র সঙ্গে এই ঘটনার তীব্রনিন্দা করেছে আর এল ডি ও সর্বভারতীয় আইনজীবী সংগঠনও (অল ইণ্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়ন)। ওই ১৯ জনের প্রত্যেকের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করারও দাবি উঠেছে। যদিও, সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনিল কুমার সাগর বলেছেন, "কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা জানার জন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্তিতেই এই ঘটনায় হতচকিত গোটা দেশ।

সুপ্রকাশ রায় (সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য) (১৯১৫ - ২১.১২.১৯৯০) গৈলা - বরিশাল (বাংলাদেশ)। স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও বামপন্থী ইতিহাস গবেষক। গৈলা স্কুল ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন। ফলে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁকে 'হিজলি ডিটেনশন্ ক্যাম্প' এবং 'বহরমপুর ডিটেনশন্ ক্যাম্প'-এ থাকতে হয়। এই কারাবাসকালে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়াশুনা করেন। কারামুক্তির পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। সক্রিয় শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ট্রাম মজদুর ইউনিয়নের একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৫-৪৬ খ্রিঃ পার্টির কলকাতা জেলা ইউনিটের সদস্য ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রি. পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে তিনি গোপনে পার্টির কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এইসময় পার্টি-ঘোষিত নীতির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং তিনি অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন। ১৯৫৬ খ্রি. হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। গোপাল হালদার ও চিন্মোহন সেহানবিশের প্রেরণায় তিনি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও লেখা শুরু করেন। সুপ্রকাশ রায় নামে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ: 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', 'বিদ্রোহী ভারত', 'ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭)', 'মাও সে তুঙ', 'পরিভাষা কোষ' (১ম খন্ড), 'গান্ধীবাদের স্বরূপ', 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক', 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো : সংগ্রামের দিশা', 'জাতি সমস্যায় মার্কসবাদ', 'মার্কসের ক্যাপিটাল' ইত্যাদি। কাফি খাঁ নামে লিখেছেন 'তেলেঙ্গানা বিপ্লব'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজন সেন নাম দিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন।

'মাও সে তুঙ' - এর জীবনীকার সুপ্রকাশ রায়ের শেষ জীবনের ইচ্ছা ছিল স্তালিনের জীবনী। শুরু করেও ছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি।

১৯৮২ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। ১৯৯০ সালের ২১ ডিসেম্বর ৭২ বছর বয়সে মারা যান সুপ্রকাশ রায় অভাবনীয় দারিদ্রকে সাথী করে। ১৯৭২ সালে তিনি 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসাবে তাম্রপত্র পান। যা পরবর্তীকালে ওঁনার কন্যা অভাবের তাড়নায় কাগজওয়ালার কাছে দশ টাকা মূল্যে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন।

একজন বিখ্যাত ইতিহাস-গবেষকের মতে — যে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের বা আজকের প্রজন্মের মনের যোগ থাকছে বেশী, তাঁদের মধ্যে দুজন খুবই বিশিষ্ট। একজনের নাম হল দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি এবং দ্বিতীয়জন সুপ্রকাশ রায়।